উটকো ঝামেলা

টিআই ডাউফ

লাবণ্যের সঙ্গে পরিচয় ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে। সুমিষ্ট মুখখানার মধ্যে অপরূপ সুন্দর নাকটি আমার এতোই ভালো লেগেছে যে, সেদিন থেকেই তার পিছু লেগে গেলাম। তার কাছ থেকে আমার ভালোবাসার স্বীকৃতি পেতে সময় লেগেছে দীর্ঘ একটি বছর। অর্থাৎ ১৯৯৮ সালের ১৫ আগস্টে আমি তার মন পেয়েছি। তার মন পাওয়ার জন্য এই দীর্ঘ একটি বছর আমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, মুখোমুখি হতে হয়েছে অনেক কঠিন পরীক্ষার।

এরপর সুযোগ পেলেই দুজনের একত্রে পথচলা। ঐতিহাসিক আহসান মঞ্জিল থেকে আশুলিয়া। ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের কোনো ডেটিং প্লেসই বাকি নেই। হাত ধরাধরি করে হেটেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কখনো বা ক্লান্ত শরীর নিয়ে পাশাপাশি নিশ্চুপ বসে থেকেছি। মন দেয়া নেয়ার পর থেকে হাত ধরাধরি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল আমাদের ভালোবাসার সম্পর্ক।

আকস্মিকভাবে আমার প্রমোশন হয়ে গেল হাত থেকে তার সারা দেহে। এই প্রমোশনের পেছনে একমাত্র সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে যে বস্তুটি তার নাম ছাতা। ঘটনাটা সংক্ষেপে এ রকম :

১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস। পারিবারিক বিশেষ প্রয়োজনে দুই দিনের জন্য গ্রামের বাড়ি চলে গেলাম। সময় স্বল্পতার দরুন লাবণ্যকে জানানোর সুযোগ হয়নি। উল্লেখ্য, আমরা উভয়েই মিরপুরের বাসিন্দা। বাড়িতে আসার পর শুরু হয়েছে ম্যারাথন বৃষ্টি। থামার কোনো লক্ষণ নেই। চারদিন পার হয়ে গেল বাড়িতেই। লাবণ্যর ভালোবাসার টানে পঞ্চম দিন ঢাকার উদ্দেশে বাড়ি ত্যাগ করলাম। ঢাকায় পৌছে পাশের বাসার কাজের মহিলা আমাদের ঘটক আম্বিয়ার মায়ের কাছ থেকে জানলাম, আগামী পরশুদিন সকাল এগারোটায় চিড়িয়াখানার বানরের খাচার সামনে লাবণ্য আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

এদিকে বৃষ্টি আগের মতোই, কখনো মুষলধারে, কখনো ধীরে ধীরে ঝরছে তো ঝরছেই। নির্ধারিত দিনে যথাসময়ে রিকশা নিয়ে বের হলাম। ভিজতে ভিজতে যথাস্থানে হাজির হয়ে আমার মানসপ্রিয়ার দর্শন পেলাম। কিন্তু বিস্মিত হলাম তার মাথায় ছাতা দেখে। কারণ লাবণ্যের কাছে ছাতা মানে উটকো ঝামেলা। তার মতে, ছাতা হলো স্মার্টনেসের অন্তরায়।

প্রায় ফাকা নির্জন চিড়িয়াখানার বৃষ্টি ভেজা পথ দিয়ে হাটতে হাটতে লাবণ্য জানালো, আজ তোকে প্রমোশন দেবো। তাই উটকো ঝামেলা ছাতাটা নিয়ে এসেছি এবং সেই সঙ্গে তোর জন্য একটি দুঃসংবাদও আছে।

বৃষ্টির বেগ কিছুটা কমেছে।

জিরাফের খাচার সামনে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আমরা দুজন একই ছাতার নিচে দণ্ডায়মান।

তোর দীর্ঘ দিনের ইচ্ছা আজ আমি বাস্তবায়ন করবো। শুধু হাত ধরাধরি নয়, আজ থেকে আমার দেহের যে কোনো অঙ্গ তুই ইচ্ছা মতো ধরতে পারবি, ছুতে পারবি। আজ তো প্রমোশন দিবস। আমার সারা অঙ্গে তোর প্রমোশন। দেরি কেন, একবার ছুয়েই দেখ না। তুই তো আবার লজ্জাবান পুরুষ। ঠিক আছে, আমি হেলপ করছি বলেই লাবণ্য আমার হাতটাকে ধরে নিয়ে তার ব্রাবিহীন সুডৌল দুটি মাংস পিণ্ডে ছোয়ালো এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাতাটাকে মাথা থেকে নামিয়ে তার বুকের সামনে ধরলো যাতে অন্য কেউ দেখতে না পায়।

আজো ভুলতে পারি না জীবনের সেই প্রথম অনুভূতির কথা। সেই লক্ষ্মী ছাতার কথা।

এরপর গলাকাটা রেস্টুরেন্টে স্যান্ডউইচ খেতে খেতে আমাকে যে দুঃসংবাদ লাবণ্য দিল তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না।

লাবণ্য বললো, বড় মামা কানাডা প্রবাসী এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী পাত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করেছেন। কানাডা তো দূরের কথা, তোর মতো ফকির তো আমাকে ঢাকা শহরের বাইরে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই ভেবেছি, সেই ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে কানাডা চলে যাবো। তার আগে যতোদিন এ দেশে আছি ততোদিন তোর জন্যই আমি বরাদ্দ থাকবো।

কথাগুলো যখন তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল তখন তার চোখ থেকে কয়েক ফোটা পানি গড়াতে দেখলাম। এ কি কষ্টের পানি, নাকি আনন্দের?

প্রমোশন দিবসের ঠিক সাড়ে তিন মাস পর স্বামীর হাত ধরে লাবণ্য কানাডা চলে যায়। যাওয়ার একদিন আগে প্রমোশন দিবসের স্মৃতিস্বরূপ উটকো ঝামেলাটা ছাতা আমাকে দিয়ে যায়। পারিনি তা সংরক্ষণ করতে। বাসা বদলের সময় হারিয়ে গেছে।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

শ্যাম বর্ণের ফেরেশতা

== এম তানভীর হোসেন পরশ

একদিন জুম্মার নামাজ পড়তে মসজিদে গিয়েছি। এদিকে সকাল থেকেই আকাশ মেঘের আবরণে ঢাকা। ইচ্ছা ছিল মসজিদে ভেতরে কোনো জায়গা দেখে সেখানে দাড়ানোর। কিন্তু এতোই দেরি হয়েছে যে, ভেতরে কোনো জায়গাই ছিল না। আমি একাই খোলা জায়গাটিতে দাড়ানো।

নামাজের দ্বিতীয় রাকাত শুরু হতেই মসজিদের টিনের ছাদ ঝমঝম আওয়াজ তুলে বৃষ্টি এলো। ভিজে গেলাম নিমেষেই। বুঝলাম ইমানের পরীক্ষা দিতে হবে। দোদুল্যমান পরিস্থিতিতে দাড়িয়ে রইলাম জামাতে। ভেতরে ইমাম সাহেব তো আর আমার অবস্থা জানেন না। তিনি অতি ধীরেসুস্থে কোরআন তেলওয়াত করে যাচ্ছেন। নামাজ তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণই নেই। তাই এক সময় জামাত থেকে বেরিয়ে আসার কথা ভাবতে শুরু করলাম। কিন্তু ভাবনাটা আর বাস্তবে রূপ নিল না। কোথা থেকে এক কৃষ্ণকায় শ্যাম বর্ণের এক কিশোর এসে আমার মাথার ওপর ছাতা মেলে ধরলো। আমি তখনো সালাম ফেরাইনি বলে তার চেহারার দিকে খেয়াল করতে পারিনি এবং ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাস যে, সালাম ফেরানোর আগেই বৃষ্টি থেমে গেল এবং আমার জন্য ছাতা ধরে থাকা ছেলেটিও চলে গেল। ফেরেশতাদের কখনো দেখিনি বলে তাদের সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু এই সময়ের জন্য আমার কাছে সে শ্যাম বর্ণের কৃষ্ণকায় কিশোরটিকে ফেরেশতা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে ইচ্ছে করে না। নামাজের মোনাজাতেও আমি শুধু এই দোয়াই করেছিলাম যে, হে আল্লাহ, তুমি যদি আমার এ নামাজ কবুল করে থাকো তাহলে এর সবটুকু সওয়াব সেই ছেলেটিকেই দিও।

চট্টগ্রাম মেডিকাল কলেজ থেকে

লাকি কুপন

মোহাম্মদ মোছাদ্দিকুর রহমান

আমাদের জোড়াতালি দেয়া সংসারের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যা ছিল রোদ বৃষ্টির সঙ্গী ছাতার। একটি মাত্র ছাতা। তাও বৃটিশ আমলের তৈরি। একেবারে নির্ধারিত মেয়াদের শেষ সীমাও অতিক্রম করেছে। অনেকগুলো ছিদ্র দিয়ে চৈত্রের প্রখর রৌদ্র আর বর্ষার রিমঝিম বৃষ্টি নির্বিঘ্নে শরীরে এসে লাগে। এরপরও এই একটি মাত্র ছাতাই ছিল আমাদের পরিবারের একমাত্র সম্বল।

এক সময় আমাদের গ্রামের পাশে একটি প্রসিদ্ধ স্থানে পশুমেলা লেগেছিল। একদিন সেই মেলায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। মেলায় আকর্ষণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল মোটর সাইকেল খেলা, সার্কাস, যাত্রা ও লাকি কুপন লটারি। এসব ছাড়াও অন্যান্য দোকানপাট ও গরু-মহিষ কেনাবেচার ব্যবস্থাও ছিল। মেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ফিরে শেষে পাচ টাকায় একটি লাকি কুপন লটারির টিকেট কাটলাম। উল্লেখ্য, টাকাটি মা দিয়েছিলেন কিছু খাওয়ার জন্য। সেই টাকা দিয়েই কুপনটি কিনেছিলাম।

বাড়িতে এসে মা কুপন কেনার কথা শুনেই রেগে গিয়ে কুপনটি আমার কাছ থেকে চাইলেন। আর সুবোধ বালকের মতো সেটি মায়ের হাতে তুলে দিলাম। অমনি মা কুপনটি ছিড়ে দুই টুকরো করে

ফেললেন। তখন আমার সে কি কান্না। ছেড়া কুপনটি আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে এবার লুকিয়ে রাখলাম। আর মনে মনে আল্লাহর নাম জপ করলাম যেন একটা কিছু পেয়ে যাই। আল্লাহ হয়তো আমার দোয়া কবুল করেছিল। লটারি ড্র হলে আমার কুপনের নাম্বার পেলাম। লাল ছাতার নাম্বারে সেটি মিলে গেছে। তখন আমি ওই কুপনটি জমা দিয়ে ছাতা নিয়ে বাড়ি এলাম। আমার সে কি আনন্দ।

মা আমার হাতে ছাতা দেখে বললেন, কি রে! ছাতা কোথায় পেলি?

তখন বললাম, সেই ছেড়া কুপনটি আঠা দিয়ে জোড়া লাগিয়ে রেখেছিলাম। এবং সেই কুপনের বিনিময়েই এই ছাতাটি পেয়েছি।

মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, ভাগ্য তোমার সঙ্গেই ছিল বাবা।

আল্লাহ হয়তো তাই করেছিল। ফলে আমাদের অনেক দিনের প্রত্যাশা একটি নতুন ছাতার অভাব পূরণ হয়েছিল।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে

কাকভেজা

কথা

১৯৯৩ সাল। আমি পাবনা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাস টেন-এর ছাত্রী। মাসটা ছিল ভরা বর্ষা মরসুমের জুলাই অথবা আগস্ট। স্কুলে দ্বিতীয় সাময়িকীর পরীক্ষা শুরু হয়।

যেদিনের ঘটনা সেদিনটি ছিল দ্বিতীয় সাময়িকী পরীক্ষার শেষ দিন। এদিন সকাল থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। তাই পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় সঙ্গে ছাতা নিয়ে যাবো এই চিন্তা আগে থেকেই করে রেখেছিলাম। কিন্তু বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করার জন্য ছাতাটা সঙ্গে নিতে একদম ভুলে যাই। সেদিন পরীক্ষা শেষ হওয়ার ঠিক দশ পনেরো মিনিট আগে মুষলধারায় বৃষ্টি শুরু হয়। আমি আর আমার বান্ধবী লুনা এক সঙ্গে রিকশায় করে যাতায়াত করতাম। এদিকে লুনাও সেদিন ছাতা আনতে ভুলে যায়। তাই পরীক্ষা শেষে দুইজন স্কুলের বারান্দায় দাড়িয়ে বৃষ্টি থামার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি।

এদিন যেসব ছাত্রীরা সঙ্গে করে ছাতা নিয়ে এসেছিল তারা তাদের ছাতার নিচে পরিচিত অপরিচিত সবাইকে হাসিমুখে শেয়ার করেছিল। তাই এক একটি ছাতার নিচে অন্তত চার পাচজন করে ছাত্রী প্রচণ্ড ঠাসাঠাসি করে সকলে বাড়ির পথে রওনা হচ্ছিল। এমনকি সেদিন বৃষ্টির জন্য যে স্বল্প সংখ্যক

রিকশা স্কুল গেটে ছিল সেসব রিকশায় এক সঙ্গে চারজন করে প্রত্যেকে ডাবল ভাড়া মিটিয়ে চাপাচাপি করে উঠেছিল।

আমি আর লুনা কেন জানি না সেদিন বোকার মতো দাড়িয়ে এসব দৃশ্য দেখে হাসছিলাম আর বৃষ্টি থামার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এভাবে প্রায় এক ঘণ্টার মতো দাড়িয়ে থাকার পর বৃষ্টি কমে ঠিকই কিন্তু ততোক্ষণে আমাদের মতো দুই চারজনই ছিল। সম্পূর্ণ স্কুল ফাকা হয়ে যায়। অবশেষে রিকশা না পেয়ে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে হেটে রওনা হই। রাস্তার মধ্যে আচমকা আবার বৃষ্টি শুরু হয়। ফলে মাত্র চার পাচ মিনিটের মধ্যে আমরা দুইজন সম্পূর্ণ গোসল করে উঠি। স্কুল ড্রেস ভিজে শরীরের সঙ্গে একদম লেপটে যায়। আশপাশে পরিচিত কোনো বাড়িও ছিল না যে, সেই বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেবো।

স্কুলের গলির রাস্তার দুই পাশ দিয়ে ছিল অনেকগুলো স্টেশনারি দোকান। এ দোকানগুলো থেকে সেদিন স্কুল পাড়ার সবচেয়ে বখাটে ছেলেরা আমাদের দুই বান্ধবীর এ করুণ অবস্থা দেখে দারুণ উপভোগ করছিল এবং জঘন্য সব মন্তব্য ছুড়ে দিচ্ছিল। এর মধ্যে পাবনার আঞ্চলিক ভাষার একটি মন্তব্য আজো মনে আছে। মন্তব্যটি ছিল, *উহু দুইডেক হেভি লাগতেছে, ধইরে দুকানের মধ্যি লিয়ে আয়।*

এই মন্তব্য শুনে আমরা দুইজন সেদিন ভয় পেয়ে প্রচণ্ড জোরে দৌড়াতে শুরু করি এবং এক দৌড়ে গলি থেকে বড় রাস্তার ওপর উঠেই দেখি আমার ভাইয়া ছাতা মাথায় এগিয়ে আসছেন। আমাদের দেখে তিনি বলে উঠেন, তোদের দেরি দেখে নিতে এলাম। কিন্তু তোদের একি কাকভেজা অবস্থা হয়েছে! এখন তোদের ছাতার নিচে হাটাও যা, না হাটাও তা।

সেদিন বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিজেও যখন ভাইয়ার সেই কালো ছাতাটার নিচে দাড়িয়ে ছিলাম তখন মনে হয়েছিল যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল খুজে পেয়েছি।

পাবনা থেকে

পুনরুদ্ধার

নাসিম বিন নজরুল ইলিয়াছ

প্রকৃতি কিংবা ঈশ্বর আমাদের কিছু ছাতা দিয়েছে। এই ছাতাগুলো দেখা যায় না। অদৃশ্য ছাতা। যেমন আমাদের পুণ্যবোধ, পবিত্রতা, পাপ–পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করে, আমাদের বুদ্ধি ও নির্বুদ্ধিতার অসহায়ত্ব থেকে রক্ষা করে এ রকম বেশ কিছু ছাতা। এই ছাতাগুলো আমাদের নিশ্চিত ধ্বংস, হিংসা,

হাহানানি থেকে দূরে রাখে। মানব সভ্যতার এগিয়ে চলা এবং টিকে থাকার পেছনে এই ছাতাগুলো বড় ধরনের ভূমিকা রাখে।

আমাদের প্রকৃতি প্রদত্ত এই ছাতাগুলো ছিড়ে গেছে ভেঙে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে কিংবা হারিয়ে গেছে। ফলে আমরা আর নিজেদেরকে সুখী, পবিত্র, আনন্দময় বা মানবিক রাখতেও পারি না। আমাদের ওপর নেমে আসছে ঘন দুর্যোগের দিন। আমরা কি পারি না, হারিয়ে যাওয়া ছাতাগুলো পুনরুদ্ধার করতে।

সিলেট থেকে

ঘটক

সখিনা ভূইয়া

ঘটক শব্দটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। ঘটকরা সাধারণত বিয়ের ঘটকালি করে। এরা সব সময়ই ছাতা হাতে করে হাটে। আমরা দুই বান্ধবী কলেজ থেকে আসার-যাওয়ার পথে বৃষ্টি এলেও ছাতা ব্যবহার করি না। আর যারা ছাতা ব্যবহার করে তাদেরকে আমরা *ঘটক* বলে ডাকি। আমার বান্ধবী বেশি ডাকতো।

একদিন একটি ছেলে ছাতা নিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক তখনি আমার বান্ধবী মানে রুমা তাকে ঘটক বলে ডেকে উঠলো।

এই কথা শুনে ছেলেটি রেগে বললো, তোমাকে আমি দেখে নেবো।

এরপর থেকে ছেলেটি আমাদের ফলো করতে থাকে। একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে ছেলেটি আমাদের অনুসরণ করে আমাদের বাসা চিনে নেয়। বিশেষ করে রুমাদের বাসা। রুমাদের পাশের বাসার এক মহিলাকে ছেলেটি চিনতো। তাকে আন্টি বলে ডাকে রুমা। ছেলেটিও মাঝে মাঝে সে মহিলাদের বাসায় বেড়াতে আসে। ঘটক বলার কারণে ছেলেটিই নিজের বিয়ের প্রস্তাব এই মহিলার মাধ্যমে রুমার বাবা মায়ের কাছে পাঠায়। এই প্রস্তাবে রুমার বাবা-মা রাজি হয়। কারণ সে ভালো চাকরি করে।

রুমাকে এক প্রকার জোর করে বিয়ে দেয়া হয়। বিয়ের পর সেই ছেলে রুমার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে। এই অত্যাচারের জন্য রুমা এক বছরের মধ্যে মারা যায়। তারপর থেকে আমি একা কলেজে আসা যাওয়া করি। যে *ঘটক* শব্দের জন্য রুমার মৃত্যু হয়েছে সেই শব্দ মুখে না আনাই ভালো।

পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম থেকে

উড়ো হাওয়ায়

হতাশা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। চারিদিক থেকে আকড়ে ধরছে আমাকে। মনের কথাগুলো, কষ্টগুলো মিলেমিশে করে তুলেছে অসহায়। ভেতরে ভেতরে আমি এতোটা অসহায় হবো সত্যিই ভাবিনি।

ভাবিনি, তাও হবে পুলকের কাছ থেকে পাওয়া কষ্ট! যাকে ভালোবেসেছি সবটুকু দিয়ে। ভালোবাসার দোকানটা ছিল তাকে ঘিরেই। কেউ চাইলেও ঘেষতে দিইনি। এ এক নিজস্ব শুচি বোধ। এতোটাই গভীর সে অনুভূতি যে আজ নিজেকে কোনোভাবে সামলে রাখতে পারছি না।

হতাশা থেকে হয়েছে অসহায়ত্ব। হুমায়ূন আহমেদের *নিশিকাব্য*–এ পড়েছি, *হতাশা গুণ নাশিনী।* হ্যা, হতাশা আমার সমস্ত গুণগুলোকে নাশ করেছে। আমার মধ্য থেকে সেই স্বতঃস্ফূর্ততা, ভালোলাগা, আনন্দ, সৌন্দর্য সব হারিয়েছে। দুর্বল মন শরীরকে করেছে দুর্বল। খেতে পারি না। সব জেনে বুঝে যে আমাকে উদ্যমহীন ভালোবাসা দিয়ে উদ্যমী করে তুলতো সে আজ আমাকে তীব্র অপমান করে। বলে, ছিল নাকি শুধুই শরীরী প্রেম। আমি হোচট খেয়ে পড়ে গেছি। দাড়ানোর শক্তিটুকুও হারিয়েছি।

ভিখারির মতো, বেহায়ার মতো ছুটে গেছি পুলকের কাছে। ফিরে এসেছি বিশ্রী সব কথার মালা গেথে।

যেখানেই যাই তার দুষ্টুমি, স্মৃতি। এভাবেই বুঝি বদ্ধমূল ধারণাগুলো পাল্টে যায়। বিশ্বাসগুলোতে ঘাটতি হয়। মানুষরূপী দুধের মাছি সব। দুর্দিনে এ জন্য বুঝি বঞ্চনাই প্রাপ্য। মানসিক পঙ্গুত্ব নিজেকে ছেয়ে ফেলেছে। সারাক্ষণ এসবই ভাবি, ভবিষ্যৎ নষ্ট করি। নিজেকে ইচ্ছা করে কষ্ট দিই। এ বুঝি নিজের প্রতি প্রতিশোধ।

অনেক নিচে নেমে গেছি। সেই শুচি বোধও আর নেই। মেয়ে হয়ে ফেনসিডিলে আসক্ত হয়েছি। নিচতলার পিয়ন এনে দেয়, আমি খাই। দারুণ লাগে। উড়ো হাওয়ায় ভালোবাসার স্বপ্নের ছাতা উড়িয়ে নিই। দারুণ লাগে।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

অবৈধ পয়সা

নজরুল

ছাতার উদ্দেশ্য মাথা বাচানো। রোদ বা বৃষ্টি থেকে এ আজব জড়বস্তুটি সুকৌশলে আমাদের রক্ষা করে সাময়িকভাবে। সুতরাং ছাতা যতো বড় হবে ততোই মাথা বাচানোর জন্য সুবিধা। এ চিন্তা মাথায় রেখে সরকারি কর্মচারী বাবার সরকারি ছাতাখানা ইউনিভার্সিটির জীবনে ব্যবহার করতে শুরু করলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য! ক্লাসে গেলেই বন্ধু-বান্ধবীরা হো হো করে হেসে ওঠে। কেউ আবার বলেই ফেলে, কোথায় পেয়েছিস এ আতেল মার্কা ছাতা?

আমার এক অভিনেতা বন্ধুও টিপ্পনি কেটে বললো, তোর ছাতা দেখে তোকেও গাইয়ে মনে হয়।

এতো সব তিরস্কারের পরও আমার ছাতার হায়া তো হলোই না, বরং এমন ছাতার মালিক হয়ে আমি দিব্যি মাতব্বরি ভঙ্গিতে চলতে থাকলাম। কারণ আমার এই ছাতার নিচে অনায়াসেই দুটো মাথা সম্পূর্ণ নিরাপদ আর একজনের জন্য তো মহানিরাপদ।

একদিন দেখলাম আমার সেই উপহাসপ্রিয় বন্ধুদের দুজন একটি পিচ্চি ছাতার তলে আসছে, বৃষ্টিতে কারো মাথা পুরোপুরি রক্ষা পায়নি। এরপর থেকে তারা আমার ছাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একদিন হঠাৎ রোদ-বৃষ্টি মুক্ত দিনে আমার সেই অভিনেতা বন্ধুটি এসে আমার এ ছাতাটি চাইলো।

বললাম, ব্যাপার কি? হঠাৎ করে গরিবের ছাতার তলব।

বন্ধুটি বললো, একটা গ্রামীণ চরিত্রে অভিনয় করতে হবে, তোর এই ছাতা বিশেষ দরকার, সারা ক্যাম্পাসে দ্বিতীয়টি আর পাইনি।

সুতরাং আমার আতেল মার্কা গ্রামীণ ছাতা আর আতেল রইলো না। টিপ্পনি কাটলেও প্রয়োজনে কেউই ব্যবহার করতে ছাড়লো না। বহু ব্যবহারের সুফল স্বরূপ এটি শিগগিরই পরিত্যক্ত হলো। কিন্তু ছাতা ছাড়া আমার চলে না। হঠাৎ একদিন আমার বেডের তলায় একটি ছোট ছাতা আবিষ্কার করলাম। উল্লেখ্য যে, নিচতলায় থাকার সুবাদে বহিরাগত অনেকেই আমাদের টয়লেট ও বাথরুম ব্যবহার করতো।

একদিন ছাতা বাইরে রেখে টয়লেট সারতে গেলে আমার বন্ধু বেডের নিচে চালান করে। বেশ কিছুদিন খোজ না থাকায় ছাতাটির মালিকানা স্বেচ্ছায় নিয়ে নিলাম। কিন্তু বিধি বাম, প্রথম দিন ব্যবহার করতেই ওটার বাটটার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ খুলে গেল। তবু বাধ্য হয়ে একান্ত প্রয়োজনে সেই পাচ ইঞ্চি বাটসহ কাজ চালাতে থাকলাম। অবশেষে টিভি রুমে সেটা ফেলে এলাম। পরে খোজাখুজি করেও এই পঙ্গু ছাতাখানার হদিস পেলাম না। আবারও ছাতা দুর্গতি।

হঠাৎ করে হলের ডাইনিং সেক্রেটারির পদটা পেয়ে গেলাম, হাতে কাচা পয়সা। সুতরাং ভালো একটা ছাতা কিনতে দোষ কোথায়? আমার সহযোগী বন্ধুসহ একই ধরনের দুজনে দুটি ছাতা কিনলাম যা কি

না টিপ দিলেই অটোমেটিক খুলে যায়। কেনার পর থেকেই পিস্তলের ট্রিগার টেপার মতো আমরা অনবরত ছাতার ট্রিগার টেপা শুরু করলাম।

পরের দিনের ঘটনা। আমার সহযোগী বন্ধুটি আমার এক বন্ধবীকে তাক করে ট্রিগার টিপতেই ছাতার উপরের অংশ ১৬ ফিট দূরে গিয়ে পড়লো। বান্ধবীটি সেই দূরত্বের বাইরে থাকায় আহত বা নিহত কোনোটাই হলো না। এরপর কোনোক্রমে সেটা ঠিক করে দুজনের এই ধরনের ছাতা বদলিয়ে আরো উন্নত মডেলের ছাতা আনলাম। এবারের ছাতায় ট্রিগার নেই, সুতরাং প্র্যাকটিসও বন্ধ।

এক সপ্তাহ পর ডাইনিংয়ের জন্য শহরের আড়ত থেকে চাল আনার সময় ছাতাটি সযত্নে হারিয়ে এলাম। অনেক খোজাখুজি করে লাভ হলো না। মনে মনে বললাম, অবৈধ পয়সার ছাতা আর কতোদিন মাথা বাচাবে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে

প্রতিফল

আবদুর রউফ

আলাউদ্দিন-আল-আজাদের *ছাতা* নামক বিখ্যাত ছোট গল্পে সাংসারিক বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনায় গৃহকর্তাকে একমাত্র ত্রাণকর্তা হিসেবে বর্ণনা করে তাকে ছাতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই গল্পে ছাতাকে একটি আশ্রয়দাতারা প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই ছাতা নামক নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুটি আমার জীবনে শুধু বিড়ম্বনাই এনে দিয়েছে।

আকাশ মেঘে ঢাকা, বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল এই ভেবে বাসা থেকে ছাতা হাতে বেরিয়ে শুধু ছাতা বয়ে বেড়ানোই সার হয়েছে। আর শুধু শুধু ছাতা বয়ে বেড়ানো যে কি বিরক্তিকর তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। আকাশে আপাতত মেঘ নেই। শিগগির বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি নামার আগেই বাড়ি ফিরে আসবো এই ভেবে ছাতা না নিয়ে বাসা থেকে বাইরে পা দিয়েই বৃষ্টির কবলে পড়েছি বা বৃষ্টিতে ভিজে জবুথবু হয়ে বাসায় ফিরেছি। এ রকম ঘটনা আমার জীবনে অহরহই ঘটে।

চৈতের প্রচণ্ড খরতাপে ছাতা মাথায় দিয়ে চলেছি। হঠাৎ দমকা বাতাস ছাতাকে মুষ্টিবদ্ধ হাত থেকে উড়িয়ে নিয়ে রাস্তার পাশে ডোবায় ফেলেছে। আবার প্রবল বৃষ্টির দাপটে ছাতার কাঠামো আমূল যায় বদলে। সবচেয়ে বেশি বিড়ম্বনায় পড়ি যখন যত্রতত্র ছাতা ভুলে রেখে আসি। জীবনে বেশ কয়েকবার এভাবে ছাতা হারিয়েছি।

মাস্টার্স পরীক্ষার সময় একদিন নিজে আধভেজা হয়ে অন্য এক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার হলে পৌছে দিয়েছি। বিরাট পুণ্যের কাজ করলাম ভেবে পুলকিত হয়েছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেই

দিনের পরীক্ষায় সম্ভবত ফোর্থ পেপারে ফেল করেছিলাম। তারপর থেকে ছাতার ব্যাপারে বেশ নিষ্ঠুর হয়ে যাই। কেউ অল্পক্ষণের জন্য ছাতা ধার চাইলে রূঢ় আচরণ করি। মুখের ওপর না বলে দিই। কেউ বৃষ্টিতে ভিজে কাক হয়ে গেলেও তার মাথার ওপর ছাতা ধরি না। আমার এমন আচরণে পরিচিতজনেরা অবাক হয়ে যায়। তবু নিজের আচরণে অটল থাকি।

একদিন শ্রাবণ মাসের এক বিকেলে ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ি ফিরছি হেটে। এদিন সকাল থেকেই অনবরত বৃষ্টি হচ্ছিল বলে ছাতা হাতে বেরিয়েছিলাম। রাস্তায় রাস্তায় গোড়ালির ওপর পানি। রাস্তাঘাটে রিকশা খুব কম বলে হেটেই ফিরছি। প্যান্টটা হাটুর কাছাকাছি গোটানো। কাদা পানি ছিটানোর ভয়ে সাবধানে মগ্ন হয়ে হাটছি। হঠাৎ ছাতার নিচে পাশে কারো উপস্থিতিতে চমকে উঠলাম। ঘাড় ফিরে তাকাতেই দেখি অপরিচিত এক মোটা মতো লোক আমার ছাতার নিচে পাশাপাশি হাটছে।

মেজাজটাই খিচড়ে গেল আমার। এভাবে কোনো সাড়া-শব্দ না দিয়ে চোরের মতো ছাতার নিচে ঢুকে পড়া। এ কি ধরনের ভদ্রতা! দেখলাম লোকটা একটা আটার ব্যাগ উচু করে বুকের কাছে ধরে আছে। বুঝলাম রাস্তার পাশে যে গম পেষার মিল আছে, লোকটা গম পেষাই করে ব্যাগ হাতে অপেক্ষা করছিল। ইতিমধ্যে আমাকে মিলের পাশ দিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে যেতে দেখেই মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে আমার ছাতার নিচে।

যাহোক, বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছি বলে খিচড়ানো মেজাজটাকে সংযত রাখলাম। মিনিট পাচেকের মধ্যে আমার বাড়ির সামনে এসে গেলাম। লোকটি বোধহয় আমাকে ও আমার বাসা চেনে। হয়তো এই মহল্লার নতুন কোনো ভাড়াটে হবে। বৃষ্টি তখনো পড়ছিল।

আমি বাড়ির সামনের গেট খোলার উদ্যোগ নিতেই লোকটি বললো, ভাই, সামনের এক বাসাতে আমি থাকি। একটু পৌছে দিন না। তা না হলে আটা বৃষ্টিতে ভিজে যাবে।

তার এই অনুরোধে এবার আমার মেজাজ পুরোটাই বিগড়ে গেল। কটমট করে লোকটির দিকে চাইলাম। তারপর হ্যা না কিছু না বলে গটগটিয়ে গেট খুলে বাসায় ঢুকে পড়লাম। দরজা বন্ধ করার সময় চকিতে দেখতে পেলাম লোকটি হতবাক ও অপ্রস্তুত হয়ে দাড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। ঘরে ঢুকে জামা কাপড় ছেড়ে আরাম করে বসে লোকটির অভদ্রতার নাকি অসহায়ত্বের উপযুক্ত জবাব দিতে পেরেছি ভেবে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম।

কবিতার *এমন বাদল দিনে বাইরে কে যায় রে* লাইনটি বার বার আওড়িয়ে ভাবলাম, যা বৃষ্টি তাতে সন্ধ্যার পর নিত্যদিনের আড্ডায় না যাওয়াই ভালো। এর চেয়ে পছন্দ মতো কিছু বই কিনে আনি। বেশ রাত পর্যন্ত মজা করে পড়া যাবে। এ রকম একটা আনন্দদায়ক সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার বের হলাম। বই-এর দোকানগুলো আধা কিলোমিটারের বেশি দূরে নয়। তাই ছাতা মাথায় হেলেদুলে চললাম। পরিচিত বই-এর দোকানে পৌছে ছাতাটা দোকানের কাউন্টারে হেলান দিয়ে রেখে রুমাল দিয়ে বৃষ্টির ছাটে ভেজা হাত ও চুল মুছছি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমার ছাতাটি উধাও হয়ে গেল।

দোকানিও তাজ্জব হয়ে গেল। সে বললো, এই তো আমিও দেখলাম আপনি ছাতা রাখলেন। নিশ্চয়ই কোনো হেরোইনখোরের কাণ্ড। তখনি সে দোকানের পিচ্চিকে পাঠালো আশপাশে দেখার জন্য।

আমি নিশ্চিত এ ছাতা আর পাওয়া যাবে না। ছাতাটা ছিল প্রায় নতুন। দোকানি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে সহানুভূতি জানাতে লাগলো।

কিন্তু আমার জন্য আরো বিড়ম্বনা অপেক্ষা করছিল। যাহোক, মনমরা ভাব নিয়ে পছন্দ মতো কয়েকটা বই বাছাই করলাম। বই-এর দাম মেটানোর জন্য পকেটে হাত দিয়েই চমকে উঠলাম। নেই। বই কেনার জন্য নিয়ে আসা পাচশ টাকার দুটো নোট নেই। ছাতাটার সঙ্গে টাকাটাও নিয়ে গেছে হেরোইনখোর। ইতিমধ্যে বৃষ্টি আরো জেকে বসেছে। অগত্যা বই কেনা মুলতবি রেখে দোকানির কাছ থেকে টাকা ধার করে আরেকটি ছাতা কিনে বাড়ি ফিরলাম।

ছাতা ও টাকা হারানোর জন্য নয়। এ জিনিসের আগেও কয়েকবার হারিয়েছি। তাই এসব গা সওয়া হয়ে গেছে। বিস্ময়বোধ করছিলাম সেই আটার ব্যাগ বহনকারী বৃষ্টি ভেজারত লোকটির সঙ্গে আমার নির্দয় আচরণের তাৎক্ষণিক প্রতিফল প্রত্যক্ষ করে।

এরপর থেকে আমি যাকে তাকে অকাতরে ছাতা ধার দিই। যেচে পড়ে বৃষ্টিতে আটকে পড়া পরিচিত, অপরিচত লোকদের লিফট দিই। ছাতা হারানোর ভয়ে নয় নিশ্চয়ই। তবে আমার রূঢ় আচরণের তাৎক্ষণিক সশব্দ চপেটাঘাত স্বরূপ প্রতিফলকে চরম গ্লানিকর এবং আত্মমর্যাদার ক্ষেত্রে অবমাননাকর বলে মনে করে সর্বদা তটস্থ থাকি।

সাগরপাড়া, রাজশাহী থেকে

অন্য জীবন

খালেদুল হক আবীর

ঘটনাটি ১৯৯৬ সালের। আমি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির লোক প্রশাসন বিভাগের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। আমাদের পৈত্রিক বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলায়। এছাড়া পল্লবীতে একটি তিন তলা বাড়ি আছে। যেহেতু মানিকগঞ্জ থেকে ইউনিভার্সিটি আসতে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল সেহেতু আমার পল্লবীর বাসার নিচতলার গারাজের পাশের যে দুটি রুম ছিল তার একটিতে থাকতাম এবং বাড়ি দেখাশোনা করতাম। কিছুদিনের মধ্যেই আমার বেশ কিছু ভালো ও খারাপ বন্ধু জুটে গেল।

একদিন আমাদের সামনের একটি বাসার দ্বিতীয় তলায় নতুন ভাড়াটিয়া আসে। তাদের মধ্যে একজন অষ্টাদশী মেয়েও ছিল। দেখতে মোটামুটি সুন্দরীও। আমরা চৈতালী নামক গাড়িতে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া আসা করতাম। পল্লবী বাসস্ট্যান্ড থেকে আমরা গাড়িতে উঠতাম। একদিন তাকেও দেখলাম গাড়িতে উঠতে। মনে মনে ভাবলাম, যাক, একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। এভাবে একই গাড়িতে যাওয়া–আসা সত্ত্বেও কথা হতো না।

একদিন ইউনিভার্সিটির বাস ডিপোতে তাকে বসা দেখে কথা বলার জন্য এগিয়ে গেলাম। নিজের পরিচয় দিলাম। সেও তার সম্পর্কে আমাকে বললো। বাসায় সে তার ভাবীর সঙ্গে থাকে। ভাই থাকে দক্ষিণ কোরিয়ায়। অন্য সদস্যদের মধ্যে ভাবীর দুই ছেলে ও ভাই থাকে। পড়াশোনা করে সমাজ বিজ্ঞানে। এ থেকেই তার সঙ্গে একটা সখ্যতা গড়ে উঠলো। তাকে আপা বলে ডাকতাম। আপা মাঝে মাঝে আমার বাসায় আসতো। একই সময় ক্লাস থাকলে একত্রে যেতাম আসতাম। এভাবে দিন যেতে থাকলো।

এক সন্ধ্যায় আপা আমার কাছে এসে বিনয়ীভাবে পনেরো ষোলশ টাকা ধার চাইলো এবং বললো, তার ভাইয়া টাকা পাঠালে পরিশোধ করে দেবে।

তাকে তখন কেমন যেন বিষণ্ন মনে হলো। টাকার প্রয়োজনের কারণ জানতে চাইলে বললো, আগামী দুই তিন মাসের মধ্যে তার কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা। বাসায় পড়াশোনা হচ্ছে না। তাছাড়া নোটও পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এখন থেকে হলে থাকবে।

আমার কাছে তখন এতো টাকা ছিল না। তাই বললাম সকালে নিতে।

আপা রাজি হলো এবং বললো, সকালে তাকে হলে পৌছে দিতে হবে।

আপা পরদিন সকালে এলো। তখন আমি টাকাটা তাকে দিলাম। টাকার ভেতর থেকে তিনশ টাকা আমার কাছে দিয়ে বললো একটি বিদেশি টিপ ছাতা কিনে দিতে। ছাতার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই বললো, দরকার আছে।

ছাতা কিনে দিয়ে আমি তাকে হলে পৌছে দিয়ে এলাম। মাঝে মাঝে দেখা করার জন্য তার ডিপার্টমেন্টে যেতাম। দিন দিন আপার ভেতর কেমন জানি পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। দামি দামি পোশাক পরতো। চুল ছোট করে কাটা।

একদিন ক্লাস শেষে বেরিয়ে দেখি আপা বাইরে দাড়িয়ে আছে। দেখা হতেই আপা টাকাটা ফেরত দিল এবং দেরিতে দেয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলো। তার ভেতর নতুন যে পরিবর্তন দেখি তা হলো তার হাতে একটি মোবাইল ফোন। কথা বলতে বলতে কলাভবনের নিচে এলাম। আমাকে কোক, আইসকৃম খাইয়ে আপা বিদায় নিল।

আমার বন্ধুদের মধ্যে কামাল কিছুটা ভিন্ন স্বভাবের। সে দৈহিক চাহিদা মেটানোর জন্য মাঝে মাঝে পল্টনের দুই একটি নির্দিষ্ট হোটেলে যেতো। কামাল একদিন জানালো, সে নাকি আপাকে উক্ত হোটেলে দেখেছে। কামালসহ কিছু বন্ধুরা পল্লবীতে থাকার সময় আপাকে চিনতো।

কামালের কথা শুনে আমি কিছুটা অবাক হলাম। বিশ্বাস করতে পারলাম না। কিন্তু আপার সাজগোজ ও মোবাইলের কথা মনে পড়লে বিষয়টা একটু জটিল মনে হলো। আমাকে কামাল বললো, তার সঙ্গে সেই হোটেলে গেলে সে নাকি আপাকে দেখাতে পারবে।

সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কামালের সঙ্গে দুই দিন হোটেলে গিয়েও তাকে পেলাম না। তৃতীয় দিন গিয়ে দেখি হোটেলের একটি রুমে তেরো চোদ্দজন মেয়ের মধ্যে আপাও। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। আমি যাকে এতো ভালো জানতাম আর সে আজ...।

আমাকে দেখে আপা স্তম্ভিত হয়ে গেল। ম্যানেজারকে কিছু টাকা দিয়ে সেই রাতেই আপাকে আমার বাসায় নিয়ে এলাম। তার এ পথে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই আপা কান্নায় ভেঙে পড়লো। এরপর আপা যা বললো তা এ রকম – বাবা অনেক আশা নিয়ে জমিজমা বিক্রি করে ভাইকে বিদেশে পাঠায়। প্রথম পর্যায়ে কিছু টাকা পাঠালেও আস্তে আস্তে তা বন্ধ করে দেয়। এদিকে দেনা পাওনা পুরো পরিশোধ না হওয়ায় বাবা আমাদের অবশিষ্ট জমিটুকু বিক্রি করেন। পড়াশোনা করার জন্য ভাবীর শরণাপন্ন হই আমি। ভাবী আমাকে রাখতে রাজি হলেন। কিন্তু তিনি আমার নিজের পড়াশোনার বদলে তার ছেলেমেয়ের দেখাশোনা তাদের পড়ালেখা ও সংসারের কাজকর্ম করার জন্য চাপ দিতে থাকলেন। ভাবী যে খরচ দিতেন তাতে আমার বই–খাতা এবং হাত খরচ চললেও নতুন ভর্তি এবং পরীক্ষা ফি দেয়া কষ্টকর হতো।

বললাম, এ জন্য আপনি বাসা ছেড়ে হলে এসে এই পেশা বেছে নিলেন?

তখন সে যা বললো, তা হলো, ঘটনার দিন বাসা ছেড়ে হলে আসার আগের দিন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি থাকায় আমি ভাইয়ের ছেলে রনির ছাতা নিয়ে ক্যাম্পাসে যাই। কিন্তু ভুলে ছাতাটা কমন রুমে ফেলে আসি। ভাবি ছাতার কথা জিজ্ঞাসা করলে বললাম, পরদিন নিয়ে আসবো। কিন্তু পরদিন কমন রুমে ছাতা আর পেলাম না। ছাতা ছাড়াই বাসায় ফিরে এলে ভাবী ছাতার জন্য অকথ্য ভাষায় বকুনি দিলেন এবং ছাতা নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায় ভাবী আমাকে একটা চড় দিলেন। আরো বললেন, বাসায় থাকতে হলে তার কথা শুনতে হবে। আমি তা মেনে নিতে পারিনি। তাই তোমাকে দিয়ে কেনা ছাতাটি ভাবীকে দিয়ে হলে চলে আসি। হলে আসার পরে প্রথমেই একটি টিউশনির চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। এদিকে চলাফেরা ও খাবার জন্য হাতে টাকা নেই। উপায়ান্তর না দেখে হলের এক বড় আপার পরামর্শ ক্রমে এবং তার সহায়তায় এই পেশায় আসা।

সে আরো বললো, হলের অনেকেই এ পেশায় জড়িত। এখানে প্রতি রাতে চার পাচশ টাকা পাওয়া যায়। মাসে ছয় সাত দিন হোটেলে যাওয়া হয়। এ থেকে যে টাকা পাওয়া যায় তা দিয়ে যাবতীয় খরচ ভালোভাবে মেটানো যায়। এই সময় এছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না।

তার মুখে এসব কথা শুনে তাকে সাহায্যের কথা বলি। আমার এক মামির মাধ্যমে তাকে এলিফ্যান্ট রোডে একটি টিউশনির ব্যবস্থা করে দিই এবং এ পথ থেকে ফিরে আসার অনুরোধ করি। ক্যাম্পাসে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়।

সে বলে, টিউশনির টাকায় খরচ সংকুলান হওয়ায় সে ওই পথ ছেড়ে দিয়েছে।

মিরপুর, পল্লবী থেকে

প্রটেকশন

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) ক্যাম্পাস যে প্রেম করার জন্য একটি আদর্শ স্থান সেটা যারা এ ক্যাম্পাসে এসেছেন কিংবা এখানে পড়াশোনা করে গেছেন তারা বিনা বাক্য ব্যয়ে এ কথা স্বীকার করবেন।

মে মাসের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে শীতল ব্রহ্মপুত্রের তীরকেই ডেটিং স্পট হিসেবে বেছে নেয়া হলো। আমার এবং তার হাতে যথারীতি একটি করে ছাতা। এখানে আরেকটি কথা না বললেই নয়, বাংলাদেশের সব ইউনিভার্সিটির মধ্যে একমাত্র বাকৃবি-র ছাত্রছাত্রীরাই রেকর্ড পরিমাণ ছাতা ব্যবহার করে। এ কথা বিশ্বাস না হলে যে কেউ পরিসংখ্যান নিতে পারেন।

সারা বছর মাঠের কাজ করতে হয় বলে ছাতা ছাড়া আমাদের কোনো গতি নেই। নদীর বাধানো তীর ঘেসে একটু আড়ালে আমরা বসলাম। আমরা আসার পর পরই মনে হলো বাতাসটা যেন একটু

বেড়ে গেছে। একটু পরেই সমস্ত আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। তবে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বৃষ্টি শুরু হবে না এটা বোঝা যাচ্ছিল। এদিকে আমার এ মন রোমান্টিক পরিবেশে নিজেকে আরো রোমান্টিক করে তুলেছে। তাকে মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গের অপ্সরী। কথাবার্তা তেমন এগোচ্ছিল না। এই পরিবেশে ভালোবাসা যায়, ফালতু আলাপ করা যায় না। এটা যেমন আমিও বুঝছি ঠিক তেমনি সেও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

সে হঠাৎ করে আমার হাতটা তার কোলে টেনে নিল। তার দিকে তাকাতেই সে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যার অর্থ একমাত্র আমিই বুঝি। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। আমাদের মতো আরো চার পাচটি জুটিকে দেখা গেল আমাদের আশপাশে। ইচ্ছে হচ্ছে আমার ঠোটের সমস্ত উষ্ণতা ঢেলে দিই তার ঠোটে। আশপাশে যথেষ্ট লোকজন রয়েছে। তারা অবশ্য বেশির ভাগই কপোত-কপোতী। সামান্য দূরে নৌকার মধ্যে বসে অলসভাবে ঝিমুচ্ছে কয়েকজন মাঝি। আমি সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম।

হঠাৎ একটি ছাতা আমার সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিল। আমাদের ডান পাশে ফিট বিশেক দূরে হবে সেখানে বিশাল দুটি তাল গাছ মাথা উচু করে দাড়িয়ে রয়েছে। সেই তাল গাছের নিচে বসা একটি জুটি আমার সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠলো। আকাশ মেঘে ঢাকা, রোদের তীব্রতা কমে গেছে। অনেকক্ষণ হলো। কিন্তু সেই জুটিটা এখনো মেলে দেয়া ছাতা বন্ধ করছে না। এ কারণেই আমার দৃষ্টি সেদিকে গেছে। ছাতার নিচে বসে থাকা মানুষ দুটির জন্য আমার কৌতূহল বোধ হলো। তারা যেভাবে ছাতা মেলে ধরে বসেছিল তাতে আশপাশের সব সচল জগৎকে আড়াল করতে পারলেও আমাদের আড়াল করতে পারেনি। কিংবা মনে হলো সে চেষ্টাও তারা করেনি। কেননা আমরাও তাদেরই পথের পথিক।

তাল গাছের নিচে বসা মানবীটিকে বেশ চঞ্চল মনে হলো। হঠাৎ মনে হলো তরুণীটি যেন মুহূর্তের মধ্যে একটা কাজ করে ফেললো। সে এমন কায়দায় তার সঙ্গীটিকে ক্রমাগত চুমু দিচ্ছিল যে ভালোভাবে লক্ষ্য না করলে তা বুঝতেই পারতাম না। সঙ্গে সঙ্গে ছাতা রহস্য এবং ছাতা প্রটেকশনের ব্যাপারটি আমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল। তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতায় আমি রীতিমতো মুগ্ধ।

তাকে ঘটনাটি দেখালে সে এমন মায়াবী হাসি উপহার দিল যার কথা আমার অনেক দিন মনে থাকবে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ছাতা মেলে ধরলাম। তারপর...। পাঠক কল্পনা করে নিন। তবে ছাতা জিনিসটা সব সময় সঙ্গে রাখবেন। সব সমস্যার সমাধানই দিতে পারে ছাতা, তা প্রেমই হোক কিংবা অন্য কিছু। একটু গবেষণা করলেই...।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

ময়মনসিংহ থেকে

শত্রু

তুহিনুর রহমান

ছাতা! দুই অক্ষরের একটি নাম। এটা রোদ-বৃষ্টিতে *মানুষের জন্য* প্রয়োজনীয় বস্তু। অতি প্রয়োজনীয় জিনিস হওয়া সত্ত্বেও আমার কোনো ছাতা ছিল না। না থেকেও এই ছাতা আমার জীবনের সব থেকে বড় আশা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমার সঙ্গে পড়তো পলি নামের একটি মেয়ে। পলি ছিল খুবই সুন্দরী। বলা যায়, আমাদের স্কুলের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। প্রথম থেকেই তার প্রতি দুর্বল ছিলাম। আস্তে আস্তে কখন যেন তাকে ভালোবেসে ফেলি। পলিও আমাকে নিয়ে ভাবতো। যদিও ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম তবুও তাকে কিছু বলতে সাহস পেতাম না। আর সে তো মেয়ে! এরপর দুজন ফ্ হবার চেষ্টা করি।এভাবে কেটে গেল একটি বছর। এরপর সাহস করে একদিন তাকে আমার ভালোবাসার কথা বলি। সে আমার ডাকে সাড়া দেয়। তারপর চলতে থাকে আমাদের প্রেম। কখনো নদীর ধারে, কখনো স্কুলের পেছনে বসে পলির কোলে মাথা রেখে আমার মনের কথা বলতাম। সুযোগ পেলে পলির ভেজা ঠোটের চুমু। এভাবে চলতে থাকে চার বছর।

১৯৯৯ সালে পড়াশোনা বাদ দিয়ে ব্যবসা শুরু করি শুধু পলিকে পাবার জন্য। আমাদের দুজনার প্রেম তখন আরো তুমুল গতিতে চলছে। আষাঢ় মাস, সকাল আনুমানিক নয় থেকে দশটা বাজে। পলি আমার দোকানে এসে উপস্থিত। পলি ভেতরে ঢুকতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বাজারে তেমন কোনো মানুষ নেই। এ কারণে পলিকে দোকানের ভেতরে নিয়ে দুজন একই চেয়ারে বসে আছি। আমার একটি হাত পলির কাধের ওপর দিয়ে তার ডান স্তনটির ওপর রেখেছি। আর পলি তার বাম হাতটি আমার কাধের ওপর দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বসে থাকায় তার বাম স্তনটি আমার শরীরের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে।

মাঝে মাঝে চুমু খেয়ে চলেছি। এর মধ্যে পার করে ফেলেছি চার ঘণ্টা। তখনো বৃষ্টি হচ্ছে। পলি সেদিন ছাতা নিয়ে আসেনি, আমার দোকানে ছিল বাবার ব্যবহারের ছাতাটা। ছাতাটা পলির হাতে দিয়ে তাকে বাড়ি যেতে বললাম। পলি ছাতাটা মাথায় দিয়ে আমার দোকান থেকে বেরিয়ে যেতেই আমার বাবা এসে হাজির। আমার জন্য দুপুরের খাবার নিয়ে এসেছেন। পলি আমার বাবাকে চিনতো

না। পলি আবার ফিরে এসে আমার সঙ্গে কিছু কথা বললো যা বাবার সামনে বলা আপত্তিকর। পলি কথাগুলো বলে চলে গেল।

বাবা আমাকে প্রশ্ন করলো, মেয়েটি কে? মেয়েটির সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক? বাড়ি কোথায়?

বাবার প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দেবো ভেবে উঠতে পারছিলাম না। শুধু এতোটুকুই বললাম, বাবা, আমি মেয়েটিকে ভালোবাসি।

বাড়িতে আমার প্রেমের ব্যাপারে কিছুটা জেনেছিল। বাবা বাড়ি থেকে এসেছেন ভিজতে ভিজতে। আমাকে বললেন, দোকান বন্ধ কর।

দোকান বন্ধ করলাম।

বাবা বললেন, ছাতা কই?

বলি, সেই মেয়েটি নিয়ে গেছে।

বাবা শোনামাত্র যেন জ্বলে উঠলেন। পরের দিন আমকে সোজা ঘাটাইলে ভাইয়ের বাসা পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর বাবা পলিদের বাড়ি যান এবং পলির বাবার সঙ্গে কথা বলেন। কি কথা বলেন জানি না। এরপর থেকে বাবা সব সময় কড়া নজর রাখেন আমার ওপর। পলির সঙ্গে দেখা হলে পলিও কথা বলে না। বাবা ছাতাটাও ফেরত নিয়ে আসেননি। এমনকি ছাতাও কেনেননি। এ কারণেই ছাতা ব্যবহার করি না। রোদ-বৃষ্টি যাই হোক না কেন, ছাতা আমার শত্রু।

চৌগাছা, যশোর থেকে

১০০%হালাল

জাকির

১৯৯৭ সালে এইচএসসি পরীক্ষার পর সেতু নামের একটি মেয়েকে পড়ানোর দায়িত্ব পেলাম। সে ক্লাস নাইনে পড়তো। প্রতিদিনের মতো সেই বিশেষ দিনে পড়ানোর উদ্দেশে বের হলাম অমনি বৃষ্টি শুরু হলো। সে কি বৃষ্টি, ছাত্রীর বাসায় পৌছালাম কাকভেজা হয়ে।

আমার অবস্থা দেখে সেতুর আম্মা বললেন, মেয়েকে আজ পড়াতে হবে না। ভেজা কাপড় বদলিয়ে নাও।

চা নাশতা খাওয়ার সময় হাতে একটি খাম ধরিয়ে দিলেন যার মধ্যে ১০০% হালাল রোজগার। সিদ্ধান্ত নিলাম আজই ছাতা কিনবো এবং সেই ছাতাটি আজো ব্যবহার করছি।

ভয়

মিতু

জীবনের অনেক ঘটনাই স্মৃতির পাতায় পাকা আসন করে নেয়। স্মৃতির পাতা উল্টাতেই ছাতা নিয়ে বিব্রতকর এক অভিজ্ঞতা বেরিয়ে এলো।

প্রায় সাত আট বছর আগের কথা। আমরা সব ভাইবোন মিলে ফুপির নতুন বাড়ি দেখতে গেলাম। কাছেই সমুদ্র সৈকত। জাহাজ ঘাট। বর্ষার মরসুমে সেখানে নাকি প্রচুর ইলিশ পাওয়া যায়। জীবনে কখনো ইলিশ মাছ ধরা দেখিনি। তাই শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং ঘোর বর্ষায়ও ছাতা নিতে ভুলে গেলাম। বৃষ্টিও অবশ্য ছিল না। তবে আকাশের কালো মেঘে মাঝে মাঝেই সূর্যটা ঢাকা পড়ছিল। আগের রাতে বৃষ্টি হওয়াতে মাটির রাস্তা কর্দমাক্ত। বেশ কয়েকবার পিছল খেয়ে পড়তে পড়তেও বেচে গেলাম। অবশেষে সমুদ্র পাড়ে পৌছে জীবনের প্রথমবার এতো ইলিশ এক সঙ্গে দেখলাম।

অজস্র মাছ ঢেউ–এর সঙ্গে এসে পাথরে ধাক্কা খেয়ে থেতলে যাচ্ছে। অনেক সময় ধরে জেলেদের মাছ ধরা দেখলাম। আরো থাকতে ইচ্ছা করছিল। তবুও অন্য সবার তাগাদার জন্য ফিরতি পথ ধরলাম। কারণ ক্রমেই সেখানে স্থানীয় কিছু বখাটে ছেলে জড়ো হচ্ছিল আর আমাদের মধ্যে ছেলের সংখ্যা কম ছিল। মাত্র দুইজন, মেয়ে ছয় সাতজন।

ঠিক তখনি দেখা দিল বিপত্তি। প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি নামলো। অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ বৃষ্টিটা যদি কমে। কিন্তু কমলো না। বাসায় চিন্তা করবে ভেবে আর বদছেলেদের ভয়ে এক রকম বাধ্য হয়েই হাটা শুরু করলাম। মনে মনে নিজেদের ছাতা না নেয়ার বোকামির কথা মনে করে গালি দিলাম। বহু কষ্টে কাচা রাস্তা পেরিয়ে যখন পাকা রাস্তায় উঠলাম তখন রিকশার দেখা নেই। এতোই জোরে বৃষ্টি হচ্ছে যে, রিকশাচালকও হয়তো ভয় পাচ্ছে বের হতে। অথচ সারি সারি দোকানের সামনে দিয়ে শরীরের সঙ্গে লেপটে থাকা ভিজে কাপড় নিয়ে ঘরে আসতে হলো। পথে কতো মধুর! নোংরা উক্তি আর বাচনভঙ্গি যে সহ্য করতে হলো!

কোনো দোকানে একটু দাড়াবো সেই পরিবেশও নেই। সবাই যেন চোখ দিয়ে শরীরটাকে গিলে খাচ্ছে। তখন সবেমাত্র বড় হচ্ছি বলে ব্যাপারটা মনে ভীষণ প্রভাব ফেলেছিল। কিছুদিন পরেই মায়ের কাছে বায়না ধরে ছোট্ট একটা ছাতা আদায় করেছিলাম। এটাই ছিল আমার জীবনের সম্পূর্ণ একার ব্যবহারের জন্য প্রথম ছাতা। ব্যাগে রাখা যায় বলে আরো বেশি প্রিয় ছিল। হারিয়ে যাবার ভয়ে

ভাইয়াদের নিতে দিতাম না। কিন্তু একদিন আমার অগোচরে ভাইয়া নিলেন এবং যথারীতি হারিয়ে ফেললেন। পরে যখন শুনলাম তখন খুব কেঁদেছিলাম। এভাবেই আমার প্রথম ছাতাটা হারিয়ে গেল। এখনো হারায়। তবে সেদিনের মতো আর কষ্ট লাগে না।

আশ্চর্যের ব্যাপার, আজকাল ব্যাগে ছাতা রেখে বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা করে। এই তো সেদিন, আমার সবচেয়ে প্রিয় নিকু ব্যাংককে চলে যাবে বলে দেখা করতে এলো। পড়াশোনার চাপ থাকবে। তাই এক বছরের আগে আসতে পারবে না। দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটু অন্যভাবে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। অনেক দিনের শখ ছিল দুইজন মিলে রিকশায় ঘুরবো। প্রকৃতি সম্ভবত আমাদের ইচ্ছাটা জানতো। এ জন্য সকাল থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। বিকেল বেলাকে ঘণ্টা হিসাবে রিকশা ভাড়া করা হলো।

একই শহরে ছোট থেকে বড় হয়েছি। পরিচিতের সংখ্যা বেশি বলে খোলা রিকশায় এক সঙ্গে যে কেউ দেখে ফেলতে পারে ভয়টা বেশি। কিন্তু বৃষ্টির জন্য পর্দা থাকে বলেই সুবিধা। তাই খুশিই হলাম। ধন্যবাদ বৃষ্টি। রিকশায় ওঠার পর হঠাৎ ইচ্ছা হলো ছাতাটা মাথায় ধরে রিকশার হুড ফেলে বৃষ্টি দেখতে দেখতে যাই। পাছে কেউ দেখে ফেলে এ ভয়ে ইচ্ছাটা অপূর্ণই থেকে গেল। এমনকি তাকে বলতে পর্যন্ত পারলাম না সে কষ্ট পাবে ভেবে। কি আশ্চর্য! ছাতা আছে, বৃষ্টি আছে, ইচ্ছে আছে, সে আছে অথচ উপায় নেই।

কথা বলতে বলতে বুঝতেই পারলাম না কখন বৃষ্টি চলে গেছে। যখন বুঝলাম তখন সঙ্গে সঙ্গেই পর্দা সরিয়ে হুড ফেলে দিল। বৃষ্টি নেই তাও পর্দা দেয়া ভাবতেই লজ্জা লাগে এবং দেখতেও খারাপ লাগে। যদিও ভীষণ ভয় হচ্ছিল। সেই তো খোলা রিকশায় ঘুরতে হলো। তবে ইচ্ছাটা অপূর্ণ এবং অনুচ্চারিতই থেকেই গেল। ব্যাগের ভেতরে ছাতাটাও হয়তো আমাদের ভালোবাসার নীরব সঙ্গী হতে পারতো! কে জানে ছোট্ট ছাতার সেই শখ হয়েছিল কি না?

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

ছায়া

সাইফুল ইসলাম

আমি ঢাকায় ভাঙারি ব্যবসা করি। গ্রামের বাড়ি হবিগঞ্জের সুনেশ্বর গ্রামে। গ্রামে জরিনা নামে এক মেয়েকে ভালোবাসতাম। জরিনা তখন ক্লাস সিক্স-এ পড়তো। স্কুলে যাবার পথে প্রতিদিন দাড়িয়ে

থাকতাম জরিনাকে দেখার জন্য। জরিনাও আমার জন্য পাগল ছিল। জরিনাকে জিজ্ঞাসা করতাম, তুমি আমার কাছে কি চাও? সে যা চাইতো তাকে তাই-ই এনে দিতাম।

মাঝে মাঝে ঢাকা থেকে যখন গ্রামে যেতাম তখন জরিনার জন্য নানান জিনিস নিয়ে যেতাম।

একদিন বৃষ্টির দিনে জরিনা আমাকে বললো, *সাইফুল, আমারে একটা ছাতি কিনে দিবাইন।*

বললাম, দেবো।

পরে ঢাকা এসে ভালো ছাতা খুজলাম। পেলাম না। একদিন ভাঙারি মালের সঙ্গে বিদেশি একটা ছাতা পেলাম দুটো শিক ভাঙা। পরে মিস্ত্রিকে দিয়ে সেই ছাতা ঠিক করে গ্রামে নিয়ে গেলাম। একদিন সুযোগ পেয়ে জরিনাকে দিলাম সেই ছাতা।

জরিনা ছাতা পেয়ে খুশি। তারপর সে বললো, *পুরনো ছাতি।*

বললাম, পুরনো হলেও বিদেশি। এর কয়েকদিন পরে ঢাকায় চলে এলাম।

একদিন গ্রাম থেকে আমার চাচাতো ভাই আফিলউদ্দিন এসে বললো, জরিনার বিয়ে হয়ে গেছে আমাদের গ্রামের রুক্কু মিয়ার সঙ্গে।

শুনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। কাজ-কামে মন বসে না। তাড়াতাড়ি গ্রামে চলে এলাম। ভাবলাম, জরিনার সঙ্গে দেখা করে তার কাছে জানতে চাইবো কেন সে এমন করলো।

তাদের বাসায় রওনা হলাম। দেখি জরিনা আর রুক্কু মিয়া আসছে রোদের মধ্যে দিয়ে। আর জরিনার জামাইয়ের হাতে আমার দেয়া সেই ছাতা যা দিয়ে তারা ছায়া পাচ্ছে। কিছু না বলে চলে এলাম। ভাবলাম থাক, বলে কি হবে। আমার ছাতা যেন চিরদিন তাদের ছায়া দেয়। এই কামনা করি।

হবিগঞ্জ থেকে

হাতেনাতে

লুনা

তখন আমি খুব ছোট। ক্লাস থৃ অথবা ফোরে পড়ি। আমরা চার ভাইবোন তখন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী। আব্বু চাকরিজীবী। ফলে বর্ষার সময় বেশ সমস্যার সৃষ্টি হতো ছাতা নিয়ে। পাচজনের জন্য পাচটি ছাতা ছিল বটে তবে ছাতা ভাঙা, হারানো, ফুটো হওয়া এ ঘটনাগুলো বর্ষাকালে ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

একবার আমার ছাতাটা গেছে ভেঙে। সবাই যার যার মতো চলে গেছে। আমি ও আমার পাশের বাড়ির এক বান্ধবী এক সঙ্গে স্কুলে যেতাম। তার ছাতায় সেদিন যাবো বলে ঠিক করলাম। এমনিতেই

তার ছাতা ছিল না, আমার ছাতায় যেতো। কিন্তু সেদিন কি আর করা! বৃষ্টি হচ্ছে টিপ টিপ করে। এবং স্কুলে না যাওয়াটা ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বিরক্তিকর। তাই সব সমস্যা পার করে স্কুলে যাবোই। এ জন্য দুইজন ঠিক করলাম, ছাতার বিকল্প হিসেবে কচুর পাতা নেবো।

আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল বড় বড় কচুর পাতা। দুটো ছিড়ে দুইজন মাথায় করে হাটলাম। আমি তো বিশ্বাসই করছিলাম না কচুর পাতা ছাতার কাজ করবে। কিন্তু হাতেনাতে ফল পেলাম। সারা পথ আমাদের মাথায় বৃষ্টির ফোটাও লাগেনি। হাত-পা একটু ভিজেছিল। আমরা কচুর পাতা মাথায় করে গেছি বলে বন্ধু-বান্ধবীরা যে কি হাসাহাসি। তবে সেদিনটির কথা আজো ভুলতে পারি না।

যশোর থেকে

বেলা

মুকুল

বন্ধ দোকানের বাইরের ছাউনির নিচে দাড়িয়ে আছি ঘণ্টাখানেক। হেচকা বৃষ্টিতে আমার জুতা জোড়া আর প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে। কোথাও কোনো লোকজনের লেশমাত্র নেই। বৃষ্টি থামার কোনো আলামত দেখছি না। যাচ্ছি বন্ধু মাসুমের বাড়ি। সে আমার সঙ্গেই প্রবাসে থাকে। আমি আসার সময়ে কিছু টাকা এবং তার ছোটবোনের কাপড়-চোপড় কিনে দিয়েছিল তাদের বাড়ি পৌছে দেয়ার জন্য।

বাস স্টপেজ থেকে মাইল তিনেক রাস্তা পায়ে হেটে তাদের বাড়ি যেতে হয়। এখানে আমি আর কখনো আসিনি। সঙ্গে টাকা-পয়সা থাকায় আমার কিছুটা ভয় ভয় লাগছিল। হঠাৎ দেখি ছাতা মাথায় কে জানি এদিকেই আসছে। একটু আশ্বস্ত হলাম। কাছে আসতেই দেখি একটা মেয়ে। মনে মনে নিরাশ হলাম। মেয়েটার সঙ্গে লিফট চাইলে অসৌজন্য হতে পারে ভেবে চুপ করে দাড়িয়ে রইলাম। মেয়েটা কিছুদূর চলে গিয়ে ফিরে তাকালো। কি জানি ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর কাছে এসে বললো, আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

আমি কিছুটা হকচকিয়ে গেলাম। গ্রামের একটা যুবতী মেয়ে আমার মতো একটা অচেনা মানুষকে লিফট দিতে চাইবে আমি ভাবিনি। বললাম, আমি মাসুমদের বাড়ি যাবো। চেনেন নাকি?

জি চিনি। আমার সঙ্গেই আসুন না। আমি সেদিকেই যাচ্ছি। বৃষ্টিতে আর কতোক্ষণ আটকা পড়ে থাকবেন? বললো মেয়েটি।

ভাবলাম, এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। একে তো বৃষ্টি থেকে উদ্ধার পাবো, তাছাড়া মেয়েটি সুন্দরী এবং সাহসী। হয়তো নিজের গ্রাম বলে ভয় পাচ্ছে না।

পাশাপাশি এবং খুব কাছাকাছি একই ছাতার নিচে হাটছি দুইজন। তার গায়ের মিষ্টি গন্ধ আমাকে মোহিত করে তুললো। মেয়েটি আহামরি সুন্দরী নয়। তবে এ কথা হলফ করে বলতে পারি তার মাঝে যা আছে আর দশটা মেয়েতে তা নেই। সত্যিই সে অনন্যা। এমন একটা মেয়েকে যদি... ছিঃ, এসব কি ভাবছি?

আমার চিন্তার রেশ ভাঙালো সেই। বললো, সামনেই আমাদের বাড়ি। আপনি এ রাস্তায় আধা মাইল সামনে এগোলেই মাসুমভাইদের বাড়ি পাবেন। আমার ছাতাটা নিয়ে যান, পরে পৌছে দেবেন।

আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমি কি আপনার নামটা জানতে পারি?

অবশ্যই, আমি বেলা।

ভাবলাম নিজের নামটা বলবো। কিন্তু মেয়েটা মুহূর্তকাল সময় না দিয়েই এক ছুটে চলে গেল বাড়ির ভেতরে। আমি তার চলে যাওয়া দেখলাম। তারপর ছাতা মাথায় গন্তব্যের দিকে হাটতে শুরু করি। ভাবনার সঙ্গে নানান চিন্তায় ডুবে যাই।

কাকে চাচ্ছেন? কথাটা শুনেই সংবিৎ ফিরে পেলাম। দেখলাম তেরো চোদ্দ বছরের একটি ফুটফুটে কিশোরী আমাকে এ প্রশ্ন করছে। বললাম, এটা কি মাসুমদের বাড়ি?

মাথা দোলালো মেয়েটি।

ছাতা নিয়ে সাত পাচ ভাবতে ভাবতে কখন যে মাসুমদের বাড়ির সামনে এসে পৌছে গেছি টের পাইনি। নিজের পরিচয় দিতেই মাসুমের বাবা–মা এসে আমাকে রিসিভ করলেন। ওনাদের আন্তরিকতাপূর্ণ আতিথেয়তায় থেকে গেলাম। পরদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে প্ল্যান মাফিক ফিরে যাবার কথা মনে পড়লো। কিন্তু কেন যেন যেতে ইচ্ছা করলো না!

বেলার কথা মনে পড়লো আর মিষ্টি মুখটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। চিরকালই মেয়েদের প্রেম ভালোবাসাকে এড়িয়ে চলেছি। তবে আজ আমার একি হলো বুঝতে পারছি না। আমি কি সত্যি সত্যি মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেলাম?

বিকেলে বেলার ছাতা হাতে বের হলাম গ্রামটা দেখার জন্য। আসলে উদ্দেশ্য দুটো। *রথ দেখা, কলা বেচা।* বেলাদের বাড়ির সামনে আসতেই দেখি বেলা শাড়ি পরে দাড়িয়ে আছে। ফিরোজা রঙের শাড়িতে তাকে দারুণ লাগছে। আমাকে দেখে এগিয়ে এলো। কেমন আছেন? আমাদের গ্রাম কেমন লাগছে? কোথাও যাচ্ছেন বুঝি? সবগুলো প্রশ্ন সে এক সঙ্গে করতে থাকে।

আমি বলি, আপনাদের গ্রামটা ঘুরে দেখতে চাই, একটু সময় দেবেন নাকি?

বেলা রাজি হয়ে যায়। বেলা ঘুরে ঘুরে আমাকে তাদের গ্রাম দেখাতে থাকে। কিন্তু গ্রামের সৌন্দর্যের চেয়ে বেলার মায়াবী দুটি চোখই আমাকে বেশি কাছে টানে। আমি তাকে দেখি আর...। আমি মুগ্ধ হয়ে বেলার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাটছি।

বেলা বুঝতে পারলো আমার মনের অবস্থা। বললো, হোচট খেয়ে পড়ে যাবেন কিন্তু।

কেন, তুমি তো পাশেই আছো?

তুমি সম্বোধন করায় সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকালো সে। বললো, আমি কি সব সময় আপনার পাশে থাকতে পারি না?

যদি তুমি চাও। সত্যি বলছি বেলা, তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি তোমাকে চাই আমার জন্ম জন্মান্তরের জন্য।

হাটতে হাটতে আমরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে এসে পৌছালাম। বিকেলের পড়ন্ত রোদে নদীর সৌন্দর্য সত্যিই অভিভূত হওয়ার মতো। একটা জায়গা পছন্দ করে আমরা বসে পড়ি।

আমি আমার কথা বেলাকে বলি আর বেলা তার কথা, তার ভালোলাগা, না লাগার কথা।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু সে আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই বললো, ব্রহ্মপুত্রের বুকে যতোদিন একফোটা জল থাকবে ততোদিন আমার এ মন তোমাকে মনে রাখবে।

মৃদু বাতাসে কখন বেলার শাড়ির আচল পড়ে গেছে সেদিকে তার খেয়াল নেই। তার বুকের দিকে তাকাতেই সে খুব লজ্জা পেল।

তার আরো কাছে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসি। সে পিছিয়ে যেতে চায়। কিন্তু তাকে ধরে ফেলি।

আমার ভেতরের কামনাটুকু সে বুঝতে পেরে বললো, ছিঃ, লোকজন দেখে ফেলবে।

আমি তার সম্মতি বুঝতে পারি। বললাম, ভয় নেই, ছাতা তো আছেই।

ছাতাটা মেলে দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে তার পেলব ঠোটে দীর্ঘ সময় নিয়ে চুমু দিতে থাকি। আমার অবাধ্য হাত দুটি তার ব্লাউজের নিচে বেপরোয়া বিচরণ করতে থাকে।

হঠাৎ এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় বেলা। *অসভ্য* বলে গালি দেয়।

আমি উঠে দাড়াই। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে আমার প্রবাসের ঠিকানা দিই। তাকে বাড়ি পৌছে দেয়ার সময় বলি, কাল আমি চলে যাবো।

বেলার চোখ দুটি ছল ছল করে উঠলো। বললো, তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করবো।

এরপর আবারও প্রবাসে। বেলাকে নিয়মিত লিখতাম, সেও লিখতো। বেশ কিছুদিন যাবৎ তার চিঠি পাচ্ছি না। তাই বাধ্য হয়ে তার ইউনিভার্সিটির হস্টেলে ফোন করলাম। বেলা ফোনে তেমন কিছু বললো না। বেশির ভাগ সময়টাই চুপচাপ ছিল।

আমি বললাম,

তোমাকে দেয়ার মতো আর কিছুই নেই আমার
শুধু জেনো, আমি হারিয়ে গেলেও
যা হারিয়ে যায়নি, যেতে পারেনি
আমার শেষ নিঃশ্বাস
সেই প্রথম ভালোবাসার মতো তোমাতেই রেখেছি
তোমারই অজান্তে।

ফোনে তার কান্নার শব্দ ভেসে এলো। তার কান্না আমাকে দারুণ কষ্ট দিয়েছে। এ কষ্ট, এ যন্ত্রণা আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না।

পাদুবা, ইটালি থেকে

বিজ্ঞাপন

ডা. আতিক

বছর পনেরো আগের কথা। স্কুলে পড়তাম। থাকতাম বাড্ডায়। রামপুরা বৃজটি ভাঙা ছিল তখন। তার ওপর দিয়ে যে কোনো যানবাহন চলাচল নিষেধ ছিল। বৃজটির উত্তর পাশের সংযোগ সড়কের দুইপাশ ছিল প্রায় ফাকা। শুধু কিছু ঝুপড়ি মতো কাচা ঘর এবং কিছু বিশাল বিজ্ঞাপন বোর্ড ছিল।

একদিন সন্ধ্যায় রামপুরা টিভি সেন্টার থেকে হেটে বৃজের ওপর উঠামাত্রই প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ঝড়ের তাড়া খেয়ে দৌড়ে বৃজ পার হয়ে রাস্তার ঢালে বাশের মাচার ওপর বসানো ঝুপড়ি মতো একটি ঘরে আশ্রয় নিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে ভরসা পেলাম না। ঝড়ো বাতাসে, অন্ধকারে ঘরটার চাল, বেড়া, এমনকি মেঝেসহ দুলছিল। এ ঘর থেকে বের হয়ে পরস্পর কিছুটা কৌণিক অবস্থানে বসানো দুটি বিশাল বিজ্ঞাপন বোর্ডের পেছনে আশ্রয় নিলাম। বেশ ভালোভাবেই বৃষ্টির ছাট সামাল দেয়া গেল।

বৃষ্টি থামার পর রিকশায় উঠার আগে একটু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিতে গেলাম কিসের বিজ্ঞাপন ছিল বোর্ড দুটোয়।

বিদ্যুৎ চমকের আলোয় দেখলাম একটিতে ছবিসহ *আলমের ছাতা* আর আরেকটিতে *শরিফ ছাতার* বিজ্ঞাপন!

উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা থেকে

বহুমুখী

মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম

মিশনারি স্কুলের পাঠ সমাপনের আগেই মাকে নিয়ে বাড়ি অর্থাৎ গ্রামের বাড়ি চলে যেতে হয়েছিল মূলত দুটি কারণে। প্রথমত. বাবার ব্যবসায় ভীষণ লোকসান হয়েছিল এবং দ্বিতীয় কারণটি ছিল, সে লোকসান পুষিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি আবার ব্যবসায় দাড়িয়ে যেতে পারা যাবে এমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না বলে।

বাবা তার ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ নিলেন। তাকে চলে যেতে হয়েছিল বরিশালে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রায়ই বাড়ি এসে আমাদেরকে দেখে যেতেন। আমার আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা প্রায় বন্ধই ছিল বলা যায়। এরপরেও আমার প্রবল আগ্রহের কারণে ছোটচাচা এবং ফুপুর সঙ্গে স্কুলে যেতাম প্রতিদিন। স্কুলের প্রতি আমার এই আগ্রহের কয়েকটি কারণ ছিল। এক. স্কুলে যে তিনজন শিক্ষক ছিলেন তারা সবাই আমাকে খুবই আদর করতেন। দুই. ছোট ফুপু আর ছোট চাচার প্রায় সব বন্ধুরা প্রতিদিনই কিছু না কিছু একটা আমার জন্য নিয়ে আসতেন।

আরেকটা ব্যাপার ছিল খুবই মজার। স্কুলে *থার্ডস্যার* (থার্ড টিচার) যখনই যে ক্লাসে যেতেন তার সঙ্গে আমিও সেই ক্লাসে যেতাম এবং স্কুল থেকে সব সময় ফিরতাম ছোট চাচার সঙ্গে। ছোট চাচার সঙ্গে বাড়ি ফেরা হতো এ জন্য যে, বাড়ি ফেরার পথে যে ঋতুতে যার গাছে যেই ফলটাই ধরুক না কেন তার একটা ভাগ পাওয়া যেতো। স্কুল থেকে হেটে বাড়ি ফিরেছি কিংবা কোথাও না গিয়ে সরাসরি বাড়ি ফিরেছি এমন ঘটনা বিরল। এবং বৃষ্টি হলে তো সব সময় একটা কাজই করা হতো শার্ট খুলে আদর্শলিপি বই, স্লেট আর চক শার্ট দিয়ে মুড়িয়ে দিতাম ভো দৌড়। এক দৌড়ে একেবারে বাড়ি।

এমনিভাবে একদিন বাড়ি ফেরার পথে বাবার সামনে পড়ে গেলাম। তিনি তখনই বরিশাল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। বাবা সম্ভবত তার ছেলে এবং ছোটভাইয়ের এভাবে বাড়ি ফেরার দৃশ্য দেখে কষ্ট পেয়েছিলেন। তাই পরেরবার যখন তিনি বাড়ি এলেন তখন সঙ্গে করে তিনজনের জন্য তিনটি চমৎকার ছাতা এবং চটের তৈরি স্কুল ব্যাগ নিয়ে এলেন। আমরা দুজনই এ বস্তুদ্বয়ের বহুমুখী ব্যবহার করতাম। যেমন চাচারা যখন কারো গাছে ঢিল ছুড়ে বরই পাড়তেন তখন তারা সেই গাছ মালিকের

হাতে ধরা পড়ার ভয়ে দূর থেকে ঢিল ছুড়তেন এবং আমি ছাতা মাথায় দিয়ে গাছের তলায় বড়ই কুড়াতাম। গাছ থেকে কাচা আম পাড়ার ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি কাজে লাগানো হতো। কিন্তু পাকা আম, জাম এবং গাব পাড়ার সময় এই পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন করা হতো। এক্ষেত্রে ছাতাটা মেলে উল্টিয়ে ধরতাম এবং চাচারা পাকা আম, জাম, গাব পেড়ে ছাতায় ফেলতেন।

আবার বর্ষাকালে যখন বজ্রপাতসহ বৃষ্টি হতো তখন দুজনেই ছাতা নিয়ে পুকুর পাড়ে চলে যেতাম কৈ মাছ ধরার জন্য। কারণ এ সময় পুকুরের কৈ মাছ কানে ভর করে পুকুর পাড়ে উঠে আসতো আর আমরা মাছ ধরে ছাতা উল্টো করে তাতে মাছ রাখতাম। অবশ্য বাড়ি ফিরে ছাতা থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টিতে ভেজার কারণে অনেক সময় মায়ের হাতে মারও খেয়েছি।

শীতের সময় মা ছাতা দিতে চাইতেন না। কিন্তু আমরা রোদের অজুহাতে ছাতা নিতাম। দুটো সম্ভব না হলে অন্তত একটি হলেও নিতাম। এবং বাড়ি ফেরার পথে ছোটফুপুর এক বান্ধবীর বাড়ির পুকুরে ছাতাটা মেলে উল্টিয়ে বড় বড় কচুরিপানার তলে ঢুকিয়ে দিতাম। এরপর ছাতায় আটকে পরা কচুরিপানা একটা একটা করে পরিষ্কার করতাম। এভাবে কৈ মাছ আর মাঝে মধ্যে চিংড়ি মাছ পাওয়া যেতো।

বাবার দেয়া ছাতার এ রকম বহুমুখী ব্যবহার করতে পেরে খুবই ভালো লাগতো। এমন কোনো একটি দিনের কথা চেষ্টা করেও মনে করতে পারছি না যেদিন বৃষ্টি হয়েছে, ছাতাও সঙ্গে ছিল কিন্তু আমরা দুইজন বৃষ্টিতে ভিজিনি। দুজনেই ছাতা ও বই ছোটফুপুর কাছে গছিয়ে দিয়ে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরতাম। ফুপু কখনোই আমাদের ছাতার বোঝা বইতে চাইতেন না। *বলতেন, মিয়াভাই কি তগো এইর লিগা ছাতি কিন্যা দিছে?*

পূর্ব জুরাইন, ঢাকা থেকে

নিরাপত্তা

উম্মে হাবিবা

কাহিনীটি আমার এক পরিচিতজনের। তার নাম দোলা। দোলা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। দোলা সবার ছোট। তাই সবাই তাকে আদর করতো। সুন্দরী ছিল বলে অল্প বয়সে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার আগেই দোলার বিয়ে হয়ে যায়। বরপক্ষ কোনো যৌতুক নেয়নি। এ জন্য দোলা খুব খুশি। কারণ সে যৌতুক নেয়া পছন্দ করে না। দোলার দুই চোখে অনেক স্বপ্ন স্বামীকে নিয়ে।

তার স্বামী বিদেশ থেকে এসে নিজের কাপড়ের দোকানে বসেছে। দোলাকে শ্বশুরবাড়ির সবাই আদর করে। বিয়ের ছয় মাস পর দোলা খেয়াল করে, তাকে শ্বশুরবাড়ির আর কেউ আগের মতো আদর করে না। তার ননদ দেববরা কথায় কথায় বলে তোমার ভাইয়েরা এটা সেটা দিল না। তবু দোলা কিছু বলতো না। মনে মনে ভাবতো, স্বামী তো কিছু বলেনি। এর মধ্যে দোলার স্বামী কাপড়ের দোকান বিক্রি করে দেয়।

এক রাতে দোলার স্বামী তাকে বলে, তোমার ভাইদের কাছ থেকে এক লাখ টাকা চাও। আমি ব্যবসা করবো। পরে টাকা শোধ করে দেবো।

দোলা বলে, তাদের পক্ষে এতো টাকা দেয়া সম্ভব নয়।

এরপর থেকে টাকার জন্য তার স্বামী এবং পরিবারের সবাই অত্যাচার করতে থাকে। দোলা এতো কষ্ট সহ্য করতে পারে না। যখন ভাবে আত্মহত্যা করবে ঠিক তখনি তার মাঝে আরেকজনের অস্তিত্ব টের পায়। তাই আত্মহত্যা করতে পারেনি। এর মধ্যে দোলা শোনে তার স্বামী আগে আরেকটা বিয়ে করেছিল। তবু কিছু বলতে পারে না সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

দোলার স্বামী খবর পাঠায় দোলার ভাইদের কাছে, দুই দিনের মধ্যে এক লাখ টাকা দিতে হবে। তা না হলে দোলাকে যেন নিয়ে যায়। দোলার ভাইয়েরা অনেক কষ্ট করেও এক লাখ টাকা যোগাড় করতে পারে না। দোলা অনেক অত্যাচার সহ্য করতে থাকে স্বামীর বাড়ি। দোলা মনে মনে ভাবে, বিয়ের আগে ভাইয়েরা ছিল নিরাপদ ছাতা। ভেবেছিল বিয়ের পরে নিরাপদ ছাতা হবে স্বামী। কিন্তু ভাগ্যে সেই ছাতা জুটলো না। প্রতিদিন দোলাকে ঝড়ে ভিজতে হয় এবং রোদে পুড়তে হয়। কে হবে দোলার ছাতা। হয়তো ভবিষ্যৎ সন্তান হবে তার নিরাপদ ছাতা। সেই ছাতার আশায় থাকে দোলা।

টাঙ্গাইল থেকে

পচা বৃষ্টি

তানহা শারমিন খান

সেদিন আম্মু পাশের বাড়ি থেকে এসে বললেন, লিপটন চাচা, ছাতা নিয়ে লেখায় ব্যস্ত। তাই আমিও আব্বুর প্রিয় পত্রিকা যায়যায়দিন এ ছাতা বিষয়ে লেখা চেয়েছে দেখে আমার প্রিয় ছাতা নিয়ে লিখবো মনে করলাম। যদিও আমার লেখা লাইন সোজা হয় না তবুও তুলিআপুর সঙ্গে যুদ্ধ করে আজ প্যাড দখলে এনেছি।

ছাতা কিনে দেবে ভালো কার্টুন ছাতা, ডিজাইন ছাতা ইত্যাদি বলে। কিন্তু কিনে দেয় না। হঠাৎ গত মাসে আমাকে অবাক করে দিয়ে নীল কার্টুন আকা এতো সুন্দর একটা ছাতা এনে দিল যে, আমি খুশিতে বাকবাকুম। পরদিন সকালে স্কুলে বান্ধবীদের দেখাবো। রাতুল, অদিতি, নবনী সবাই অবাক হবে। এই খুশিতে আমার ঘুম আসছিল না। সকালে উঠে দেখি বৃষ্টি নেই, ঝকঝকে রোদ্দুর।

আপু আমাকে ছাতা নিয়ে স্কুলে যেতে দিতে চায় না। বলেন, ছাতা নাকি আমি হারিয়ে ফেলবো। তাই প্রথম দিন ছাতা মাথায় দিতে পারলাম না বৃষ্টি নেই বলে।

বৃষ্টি খুব পচা

লেবুর পাতা করমচা

যা বৃষ্টি চলে যা

ছড়াটি আমি আর বলবো না।

কলেজিয়েট স্কুল, খুলনা থেকে

স্বপ্ন

সাবিনা

আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। সাত মাস হতে চললো এ বাড়িতে এসেছি। প্রতিটি ফ্ল্যাট স্বতন্ত্র। অর্থাৎ কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই। প্রতিদিনের একঘেয়েমি আর কলেজে ক্লাস আমাকে আরো অতিষ্ঠ করে তুলছিল। কিছুটা একঘেয়েমি দূর করতেই এক বিকেলে উঠেছিলাম বাড়ির ছাদে। যদিও ছাদে অন্য ফ্ল্যাটের লোকজন ছিল তবুও কারো সঙ্গেই কোনো কথা হয়নি। আকাশে সেদিন ভাঙা ভাঙা মেঘ ছিল। ভাঙা মেঘের মাঝে নীল আকাশ, দখিনা বাতাস এবং পড়ন্ত বিকেলের মৃদু সূর্যের আলো এক ব্যতিক্রম অনুভূতির জন্ম দেয়। মনে–প্রাণে, সারা দেহ জুড়ে সত্যি অপরূপ সেই দৃশ্য।

হঠাৎই এক পশলা বৃষ্টি। এ বৃষ্টির উদ্দেশ্য যেন খরার সমস্ত শরীর সে ছুতে চায়। দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলাম ছাদে দাড় করানো ছাতাটির নিচে। অনেকেই এ বেহায়া বৃষ্টির দূরন্ত ঝাপটায় নিজ বাসায় ফিরে গেলেও কিসের যেন এক গভীর টানে ছাদেই থেকে গিয়েছিলাম। আমি ছাড়াও ছাদে থেকে গিয়েছিল আরো কয়েকজন। হঠাৎ করেই তাদের একজন দৌড়ে এসে একই ছাতার নিচে আমার পাশে এসে দাড়ালো। আমি কিছুটা অবাক, কিছুটা বিমোহিত। বৃষ্টির ঝাপটা এসে গায়ে লাগছে। ছাদে থাকা নানান রঙয়ের, নানান প্রজাতির ফুটন্ত ফুলের গাছগুলোর ফুলের পাপড়ি এবং পাতার ওপর বৃষ্টি কণাগুলো চুমু খেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। সব কিছু মিলিয়ে এক অনন্য অনুভূতি, অন্য রকম

ভালোলাগা। তার ওপর কারো পাশে থাকা, হোক না সে অপরিচিত। মৃদু কথায় তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। জানলাম তার নাম সাজু। আমারটাও জেনে নিল। আরো জানলাম, সে ঢাকা ইউনিভার্সিটির হিসাব বিজ্ঞানে ফাইনাল ইয়ারে পড়াশোনা করছে। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে। অথচ কি আশ্চর্য, একদিনও তাকে দেখলাম না। সেও আশ্চর্য না হয়ে পারলো না।

তারপর প্রায়ই ছাদে উঠতাম। সত্যি কথা বলতে কি, শুধুই তাকে দেখার জন্য, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য। তার সব কিছুই ভালো লাগার মতো। তার চেহারা, চরিত্র, হাসি, কথা বলার ভঙ্গি এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আমাকে দিনে দিনে দুর্বল করে দিতে লাগলো। প্রায়ই সেই ছাতাটার নিচে বসে মেতে উঠতাম গল্পে ও আড্ডায়। ধীরে ধীরে আমাদের মাঝে সম্পর্কটা গাঢ় হয়ে উঠলো। তখন তাকে নিয়ে মৃদু মন্দ স্বপ্ন দেখি, এক অন্য রকম স্বপ্ন, ভালোবাসার স্বপ্ন।

এক বিকেলে আমাকে অবাক করে দিয়ে, আমার স্বপ্নকে রাঙিয়ে সে বললো, ভালোবাসি।

আমি খুশিতে আত্মহারা। হৃদয়ের আকাশের তারাগুলো এক সঙ্গে জ্বলে উঠলো। সমস্ত পৃথিবীটাই রঙিন আর সব কিছু ভালোলাগার মতো। আমি কি শুনলাম। ঠিক শুনলাম তো? নাকি এ আবার কোনো স্বপ্ন। না তো, আমি তো তার সামনেই। সেই ছাদে, সেই একই ছাতার নিচে। আমার হাত তার হাতে কখন চলে গেছে লক্ষ্য করিনি। তাকিয়ে আছি দুজন দুজনার দিকে। শুরু হলো ভালোবাসা। এক দুরন্ত ভালোবাসা। তারপর থেকে স্বপ্ন ও আশা। দুজনে ঘুরেছি উন্মাতাল হাওয়ায়। দুজনকে আবিষ্কার করতাম টিএসসি, ওয়ান্ডারল্যান্ড, রমনা, বোটানিকাল গার্ডেন কখনো বা আশুলিয়ায়। কতো সুখ-দুঃখের ঘটনা রচনা করেছি আমরা।

এক পূর্ণিমা রাত। চাদের আলোয় পৃথিবী আলোকিত। চাদের আলো ঠিকরে পড়ছে পৃথিবীতে। এবং প্রতিটি আবেগী মনকে আরো আবেগে ভরে দিচ্ছে। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো। স্মৃতির পাতায় এমন পূর্ণিমার রাত ধরে রাখতে ছাদে আসতে বললো।

চুপি চুপি ছাদে চলে এলাম। সে অপেক্ষা করছে আমার জন্য সেই ছাতাটার নিচেই। সত্যিই তো, এমন চাদনি রাত কোনো প্রেমিকযুগলই হয়তো এমন রাতে প্রিয়ার সান্নিধ্য ব্যতীত ছটফট করবে। এসে বসে পড়লাম তার পাশে।

দুজনেই নিশ্চুপ, আমার হাত তার হাতের মধ্যে। মন চায় আরো গভীর হয়ে মিশে যাই। ধীরে ধীরে সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আলতো করে আমার ঠোটে চুমু খেলো। আমিও সাড়া না দিয়ে পারলাম না। দিতে বাধ্য করছিল সেই মায়াবী চাদ এবং তার মাদক জ্যোৎস্না। তাকে দুই হাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম।

সে আস্তে আস্তে আমার বুকে হাত রাখে। মৃদু চাপ দিতে থাকে আমার বুকে। অজানা আর অচেনা এক শিহরণে পুলকিত হচ্ছি। কতো সুখ এই স্পর্শে। ধীরে ধীরে সে যেন আরো গভীরে যেতে চায়। আমার সমস্ত শরীর কেপে উঠছিল যেন পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। তবুও তাকে বাধা দিয়ে নিচে নেমে এলাম। একে তো চাদের আলো, তার ওপর বাড়তি প্রিয়জনের দেয়া সুখ।

সারাটা রাত স্বপ্নে কেটেছিল। এভাবেই যখন দিনগুলো চমৎকারভাবে কাটছিল তখন উভয়ের পরিবার আমাদের সম্পর্কের কথা জেনে যায়। তবে দুই পরিবার সম্পর্কটাকে সমর্থন করে স্থায়ী রূপ দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। আমি বর্তমানে অনার্সে পড়ছি। এবং সে বিসিএস দিয়ে একটি কলেজে কর্মরত আছে। এভাবে কাটছে দিনগুলো। প্রতীক্ষায় আছি সেই দিনটির যেদিন বধূ সেজে তার বাসর রাঙাবো।

আমরা স্থির করেছি, যে ছাতার নিচে বসে আমাদের প্রথম পরিচয়, প্রথম স্পর্শ, সেই ছাতার নিচে বসে দুইজনে বাসরের পরের রাত জ্যোৎস্না আর স্বপ্ন দেখবো অনাগত ভবিষ্যতের।

ঢাকা থেকে

নিরঞ্জন

সৈকত দে

বাবা, একটা ছাতা কিনে দাও।

এখন মাসের শেষ। পারবো না। পরে।

অপরাধী স্বরে আমার প্রশ্ন এবং সংসার চালনাজনিত কষ্টকর পরিস্থিতি মোকাবেলার চাপে মস্তিষ্কের নিউরন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় খিটখিটে স্বরে বাবার উত্তর।

না বাবা, এখন বর্ষা। বৃষ্টিতে কোচিং, স্কুলে যেতে সমস্যা হয়। দেবে না?

গোয়ার গোবিন্দের প্রশ্নের উত্তরটা বাবা চপেটাঘাতে দেন। একটি সজোর শব্দ, খানিক গোঙানি ও ফোপানির মিশ্রণ এবং সব নিস্তব্ধ, দুই একটা ট্রাক, বাসের শব্দ নিস্তব্ধতাকে সশব্দ করছে। খারাপ লাগতে থাকে আমার। শারীরিক এবং মানসিক কষ্টের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হই এবং এরপর প্রতিবাদী হই, না, বেরিয়ে যাবো যেদিকে দুচোখ যায়। এই টানা হেচড়ার সংসারে আর না।

চট্টগ্রাম রেলওয়ে প্ল্যাটফরম। পকেটে পনেরো টাকা। সারা গা কাকভেজা, মনে দ্বিধা। আগামীকাল বর্ধন স্যারের ক্লাস, হোমটাস্ক হয়নি। দ্বিধা মুছে যায় প্রতিজ্ঞায়। আর তো যাচ্ছি না, এখন আমি মুক্ত।

কালুরঘাটের বাস ধরে সেখানে যাবো। সেখানে কোনো এক হোটেলে কাজ করবো, রাতে সাহিত্য চর্চা, গ্রেট ম্যান হতে হবে।

সুতপাদি বলেন, চাপের ফলে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরিত হবো আমি। বাবাকে দেখাবো, আমিও পারি। দুচোখে স্বপ্ন এবং ক্লান্তি। ভ্রাম্যমাণ টি স্টল থেকে কলা–রুটি খাই। চা পান করি। চার টাকা শেষ। রইলো বাকি এগারো। ওরা এগারোজন। হাসি পেল হঠাৎ। প্ল্যাটফর্মের পিলারের নিচে বসি। একটা বিশাল হলরুম... পেঙ্গুইন দাড়িয়ে সারি সারি। আমিও পেঙ্গুইন.. ঘোষিত হলো সাহিত্যে নোবেল...স্বপ্নটা হারিয়ে যায়। চোখ মেলি ঝাকুনিতে। বিশাল একটা মুখ ঝুকে আছে আমার ওপর। মূর্তির দুচোখ ছলছলে। এক ফোটা গরম জল গালে পড়ে। আর্দ্রস্বর প্রশ্ন করে– *কই গিয়েছিলি বাপ না বলে? শুয়ে ছিলি কেন এমন করে?*

বাসার সেই ছোট ঘর। মায়ের দুচোখে কপোতাক্ষ আর তিতাস। সাত বছরের ছোট বোন কাদতে কাদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটি নতুন ছাতা ঝুলছে আমার ঝোলানো স্কুলের ব্যাগের পাশের আংটায়। মিকিমাউস ছাতা। অনেক ছবি মিকির। ঘুমিয়ে পড়ি আনন্দে। এখন–ই আমি গ্রেট ম্যান, নোবেল দরকার নেই আমার।

অনেক বছর আগের কথা। ক্লাস এইটে পড়ার স্মৃতি ভেসে এলো আজ বৃষ্টিতে ভিজতে গিয়ে। আজো আমার ছাতা নেই। আমি খুব ছাতা হারাই। মস্তিষ্কের নিউরন বিশেষ কিছু মুহূর্ত আজীবন ধরে রাখে? দুটি কারণে আমার বুকের জমাট কষ্ট আজো ভারাক্রান্ত করে। প্রথম কষ্টটি দুঃখের স্মৃতিময় ছাতাটি নেই। দ্বিতীয় কষ্ট বেদনার আর মহত্তম উপলব্ধির। কতো ভালো আমার বাবা। নিজের আনন্দ বিসর্জন দেন। *নিরঞ্জন* নামের সার্থকতা ধারণ করে বাবার খুব প্রিয় ঘড়িটি পরদিন ঘুম থেকে উঠে আমি আর বাবার হাতে দেখিনি।

চট্টগ্রাম থেকে

সেতু

জসীম মাহমুদ

রুমে ঢুকেই সুসংবাদ পেলাম। আমার ফোন এসেছে উত্তরপাড়া মানে, লেডিস হল থেকে। আমি যুগপৎ বিস্মিত এবং রোমাঞ্চিত! বিস্মিত এই কারণে যে, ইউনিভার্সিটিতে আমাদের ক্লাস শুরু হয়েছে মাস খানেক হলো। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ঠিকই কিন্তু ফোন করে খোজখবর নিতে হবে এমন পর্যায়ে সম্পর্কটা গিয়ে এখনো ঠেকেনি। এরপরও আমার ফোন এসেছে

এবং মূল লেডিজ হল থেকেই। বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। সংবাদদাতা অর্থাৎ আমার রুমমেট জাকিরভাইয়ের কথা শুনলেই রোমাঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটা ঘটে। জাকিরভাইয়ের আপসোস, আহা রুমমেট! তোমার কপাল একখান। তিন বছর হলো ইউনিভার্সিটিতে এসেছি অথচ কেউ খবরও নিল না। আর তুমি আসতে না আসতেই লেডিস হল থেকে ফোন আসা শুরু হয়ে গেছে।

আমি এই রুমে উঠেছি মাত্র দশ বারো দিন। এলাকার একপাতি নেতার বদান্যতায় অনেকটা ভাগ্য জোরে সিটটা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাই। জাকিরভাই আমার সিনিয়র রুমমেট। সিনিয়র হলেও বেশ মজার লোক এবং মিশুক। জাকিরভাইয়ের কথা শুনে আমি বিব্রত বোধ করি। খানিকটা লজ্জাও লাগে। কিন্তু বলে বিশ্বাস করাতে পারবো না যে, কোনো মেয়ের সঙ্গে এখনো আমার খাতির হয়নি।

হলে ওঠার আগে বেশি দিন বাসা ছেড়ে কোথাও থাকিনি। বাসার জন্য মনটা কেমন জানি করছে। তাছাড়া সবগুলো ক্লাস এখনো শুরু হয়নি। তাই কাউকে কিছু না বলে হুট করে বাসায় চলে যাই। পাচ দিন ছিলাম। আজ এসেছি। কিন্তু কার এতো দয়া হলো যে, আমার মতো অভাগাকে ফোন করে জাকিরভাইয়ের আপসোসটা বাড়িয়ে দেয় এটা ভেবে সারা রাত কাটলো। কোনো কূল-কিনারা পাই না।

পরদিন ক্লাসে গেলাম। নিজের অজান্তেই বার বার চোখ চলে যাচ্ছে মেয়েদের দিকে। শুধু এটাই মনে জাগছে, একটি মেয়ে আমাকে ফোন করেছে। এদের কেউ কি? পুরো ক্লাস জুড়ে আটজন মেয়ে। এদের দুই চারজনের নাম জানি বটে কিন্তু আলাপ করার সুযোগ এখনো হয়নি। পুরোটা সময় মনটা কেবল খচখচ করে কাটলো।

ক্লাস শেষ চলে আসবো হঠাৎ ডাক শুনে থমকে দাড়াই। আমাদের ক্লাসের সুন্দরীদের একজন মারিয়া। আমার হার্টবিট বেড়ে গেছে। বুক দুরু দুরু করছে। কাছে গেলাম।

তুমি জসীম? মারিয়ার জিজ্ঞাসা।

হ্যা। কোনো রকমে বলি।

এতোদিন ক্লাসে আসোনি কেন? তোমার হলে দুইবার ফোন করেছি। পাইনি। কোথায় ছিলে? এক সঙ্গে এতোগুলো প্রশ্ন করে হাপিয়ে ওঠে মারিয়া।

আমার বুকটা ধক করে উঠলো। তাহলে মারিয়া ফোন করেছিল! এ আমার বিশ্বাস হতেই চায় না। ঘোরের মধ্যে পড়ে যাই। কোনো রকমে জবাব দিই বাসায় গিয়েছিলাম।

জানা গেল ফোন করার আসল মাজেজা। আমার ছাতাটা নাকি মারিয়ার কাছে চলে যায়। তারটা খুজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমার ভীষণ অবাক হওয়ার পালা। কারণ আমার ছাতাটা এখন বহাল তবিয়তে লকারে অবস্থান করছে। বাসায় যাবার সময় সেটা এখানেই রেখেছি সযত্নে। কিন্তু না, আমার বিশ্বাস ভুল। সেটা লকার থেকে উড়াল দিয়ে মারিয়ার কাছে না এলেও তার হাতের ছাতাটা যে আমার তা বুঝতে পারছি বেশ। আমার ছাতার ভেতরের দিকটা শাদাটে। সেখানে আমার নাম লিখে রেখেছিলাম। নামটা এখন আমার অবিশ্বাসী চোখকে বিদ্রূপ করছে।

আসল ব্যাপার বোঝা গেল কিছুক্ষণ পরেই। আমাদের ক্লাসের পেছনের দিকে এক চিলতে ফাকা জায়গা। শুকানোর জন্য আমরা ভেজা ছাতাগুলো সেখানে মেলে দিই। বাসায় যাবার দিন দুটো ক্লাস করেই চলে আসি। আসার সময় তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে ভুল করে মারিয়ার ছাতাটা নিয়ে চলে আসি। কারণ আমার আর মারিয়ার ছাতা হুবহু এক। এবং নাম দেখে মারিয়া বুঝতে পারে ছাতাবদল হয়েছে। আমার হলমেটদের কাছ থেকে রুম নাম্বার জেনে আমাকে ফোন করে। আমি বাসায় গিয়েছি এটা কেউ জানে না।

এরপর আমাদের মাঝে প্রায়ই কথা হতো, ফোন হতো। এক সময় আমরা বন্ধু হয়ে যাই। আস্তে আস্তে আমরা আরো কাছাকাছি আসি। এখন আমরা এক সঙ্গে করিডোরে হাটি। বোটানিকাল গার্ডেনে গাছের শীতল ছায়ায় পাশাপাশি বসি। ব্রহ্মপুত্র নদের ঘোলা জলে নৌকায় চড়ি। কখনো বা রিকশায় করে ঘুরে বেড়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা। স্বপ্ন দেখি নতুন ভুবনের।

আমাদের মাঝে এই যে সম্পর্ক এর সমস্ত কৃতিত্ব ছাতার। ছাতাই সেতুবন্ধন হয়ে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে

ভাই

শিরীন সুলতানা

ঘটনাটা অনেক দিনের। তখন ক্লাস ফোরে পড়ি। বাবা সরকারি কর্মচারী হওয়ায় আমরা তখন কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারায় থাকতাম। সেখানকার সরকারি স্কুলে পড়তাম। কি রোদ, কি বৃষ্টি ক্লাসের সকলেই ছাতা নিয়ে স্কুলে যেতাম। আমার ভাই আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আমাকে মাঝে মাঝে

বলতেন টু ফোল্ডের ছাতা কিনে দেবো তোমাকে। তাই কলকাতায় যখন বেড়াতে যান তখন বলেছিলেন আমার জন্য একটা টু ফোল্ডের ছাতা নিয়ে আসবেন। প্রতীক্ষায় দিন গুণতে থাকি।
একদিন প্রতীক্ষার পালা শেষ হলো। ভাই এলেন আমার জন্য সেই কাঙ্ক্ষিত ছাতা নিয়ে। আমি তো আনন্দে আত্মহারা। কারণ এখনকার মতো টু ফোল্ডের ছাতাগুলোর এতো বেশি প্রচলন ছিল না। পরদিন রেল লাইনের পাশ দিয়ে স্কুলে যাচ্ছি। আকাশটা একটু মেঘলা ভাব থাকায় ছাতাটা হাতে নিয়ে যাচ্ছি। মনের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার হাতটা কেমন একটু হালকা মনে হলো। ব্যাপারটা ঠিক মাথায় আসছে না। তাই দুই পা এগিয়ে পেছনে ফিরে দেখি আমার ছাতার দ্বিতীয় অংশ আমার থেকে একটু দূরে পড়ে আছে আর প্রথমাংশ আমার হাতে। এই মুহূর্তে কি করবো বুঝতে পারছি না। মনে মনে রাগও হচ্ছিল এবং হাসিও পাচ্ছিল। তাই দৌড় দিয়ে বাসায় গিয়ে ভাইয়ের হাতে ছাতাটা দিয়ে স্কুলে গেলাম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। ছাতাটা নষ্ট করে ফেললাম। একদিনও ব্যবহার করতে পারলাম না। বাসায় ফিরে এসে দেখি ছাতাটাকে কিভাবে যেন ভাই ঠিক করেছেন। খুব ভালো লাগলো ছাতাটা আবার ব্যবহার করতে পারবো এই ভেবে।
এর মাঝে অনেক সময় পেরিয়ে গেল। দিনাজপুর কৃষি কলেজে ভর্তি হলেন ভাই। এবং আমরাও সৈয়দপুরে ট্রান্সফার হয়ে চলে এলাম। আমার ছাতাটা কাউকে ব্যবহার করতে দিতাম না। একদিন বৃষ্টির মাঝে দিনাজপুর যাবেন বলে ছাতাটা কিভাবে ভাই নিয়ে গেলেন। ক্যাম্পাসে গিয়ে ছাতাটা চুরি হয়ে যায়। মন খারাপ করবো বলে আমাকে ব্যাপারটা জানানো হলো না। কিন্তু বুঝতে পারলাম। তারপর একটা নতুন ছাতা নিয়ে এলেন আমার জন্য। কখনো ভুলতে পারিনি আমার প্রথম ছাতাকে এবং সেই হাস্যকর ঘটনাটাকে। আমাদের গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ায়। যেতে হয় ভেড়ামারার ওপর দিয়ে। যখন বাড়ি যাই তখন ট্রেনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি সেই ঐতিহাসিক স্থানকে। খুব হাসি পায় এবং কষ্ট লাগে পুরনো বান্ধবীর কথা মনে পড়ে। আহ! সেই দিনগুলো কতো সুন্দর ছিল। তাই মনের অজান্তেই হারিয়ে যাই সেই সুন্দর দিনগুলোর মধ্যে।

সৈয়দপুর, নীলফামারী থেকে

সঙ্কট

তারিক অনিকেত

আমার মাথার ওপর এখন আর কোনো ছাতা নেই। আমার বাবা যেদিন মারা যান সেদিনই আমার মাথার ওপর থেকে ছাতাটা সরে যায়। এখন আমি অনবরত রোদে পুড়ছি, বৃষ্টিতে ভিজছি। বাবা

ছিলেন আমার মাথার ওপর ছাতা। আমার শৈশব, কৈশোর, এমনকি যৌবনের অনেকখানি সময় তিনি সঙ্কটের রোদ বৃষ্টি থেকে পরম যত্নে মাথার ওপর ছাতা হয়ে আমাকে রক্ষা করেছিলেন।

মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল থেকে

ছুটি

আবদুল মতিন মুক্তা

আচ্ছা মা, ছাতা নিয়ে তোমার কোনো স্মৃতি মনে পড়ে? মধ্য বয়সী হাজেরা খাতুনকে জিজ্ঞাসা করে তার কলেজে পড়ুয়া মেয়ে আনজু।

কেন রে? সেলাই থেকে মাথাটা তুলে মেয়ের দিকে তাকায় হাজেরা।

এমনি। যদি থাকে তাহলে আমাকে বলো।

হাজেরা খাতুন দৃষ্টি মেলে ধরে অতীতের দিকে। অনেক দিন আগের কথা। তখন তার কতোই বা বয়স হবে, তেরো কি চোদ্দ। ছয় ভাইবোনের মধ্যে সে দ্বিতীয়। বড়বোনের নয় বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে গেছে ফুপুর ছেলের সঙ্গে। এখন সংসারে সে-ই বড়। বাবা চল্লিশ টাকা বেতনে একটি বেসরকারি মেয়েদের মাইনর স্কুলে চাকরি করেন। বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে সে স্কুল। প্রতিদিন সকাল ৯টার মধ্যে বাবা বাড়ি থেকে বের হতেন আর ফিরতেন মাগরিবের আগে। দাদা ২২ গ্রামের মধ্যে ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হলেও তার অবর্তমানে তার প্রথম পুত্র বাবার নাম ডুবিয়ে সব কিছু শেষ করে ফেলেছিলেন।

হাজেরার বাবার বয়স যখন তেরো চোদ্দ তখন দাদা-দাদি দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। বড়ভাই তখন মুরুব্বি। বাবার মনটি ছিল অনেক বড়। তাই সংসারের কোনো কাজেই তিনি নিজেকে কখনো জড়াতেন না। বড়ভাইকে বিশ্বাস করে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে সংস্কৃতির বিভিন্ন কাজে মনোনিবেশ করেন। এই সুযোগে পিতার সকল সম্পত্তি, নগদ অর্থ ও ব্যবসা সব কিছু বড়ভাই ধীরে ধীরে শেষ করে ফেলেন। যে সম্পত্তিটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও চলে গিয়েছে যমুনার গর্ভে। হাজেরা যখন বুঝতে শিখেছে তখন থেকেই দেখছে তাদের সংসারে এই দৈন্যদশা। তাত শিল্পের এলাকা হিসেবে মেয়েরা অনেক কাজ করতো নিজেদের সংসারের সচ্ছলতা ফেরানোর জন্য। হাজেরাও মায়ের সঙ্গে অনেক কাজ করতো সংসারের একটু সচ্ছলতা আনার জন্য।

তার ঝোক ছিল সেলাই–এর প্রতি। লেখাপড়ার ফাকে ফাকে সুই–সুতা দিয়ে ছোটবেলায় সে নিজের ছোট ভাইবোনের ও মায়ের কাপড় সেলাই করে দিতো। তার হাতের কাজ এতোটাই সুনিপুণ ছিল যে, অনেকে ঈদ বা পূজায় তাকে দিয়ে পোশাক তৈরি করে নিতো। এতে করে তার বেশ কিছু আয় হতো। বিদেশিদের মতো ফর্শা আর সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিল হাজেরার বাবা। চৈত্রের রোদে পুড়ে আর আষাঢ়ের বৃষ্টিতে ভিজে বাবা যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতেন তখন হাজেরার মনটা হু হু করে উঠতো। মনে মনে কতোবার ভেবেছে বাবাকে একটি ছাতা কিনে দিতে হবে। কিন্তু সংসারের টানাটানিতে একটি ছাতা কেনার মতো টাকা সঞ্চয় করতে পারেনি হাজেরা। তাদের সংসারে ক্যান্সারের মতো পেয়ে বসেছিল মামলা। জন্মের পর থেকেই দেখছে তাদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে ভোগাচ্ছে তার বড়চাচা। বাবাকে সহজ–সরল পেয়ে সব কিছু আত্মসাৎ করে মাথা গোজার জন্য যে বাড়িটি ছিল সেটার প্রতি বড়চাচার লোভাতুর দৃষ্টি পড়েছিল। সেই মামলা নামক ক্যান্সারটি তাদের সংসারটাকে মাথা তুলে দাড়াতে দিতো না। তার মনে পড়ে, মাঝে মাঝে বাবা সেই সকালে ফজরের আজানের সময়ে উঠে গয়নার নৌকা করে মহকুমা শহর সিরাজগঞ্জে যেতেন মামলার হাজিরা দিতে। টাকার অভাবে অনেক সময় হাজেরার তিল তিল করে জমানো টাকাটাও বাবার হাতে তুলে দিতে হতো।

হাজেরাদের বাড়িটি ছিল একটি অসাধারণ বাড়ি। ফজরের আযানের ধ্বনি কানে পড়তেই মা ডেকে তুলে দিতেন হাজেরাকে। আধো আলো আধো ছায়ার মধ্যে হাজেরা ঘুম ভাঙা চোখে উঠান ঝাড় দিয়ে উঠানোর চারদিকে বিছিয়ে দিতো চাটাই, মাদুর আর চটের বিছানা। ভোর হতেই আসতে থাকতো পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মায়ের কাছে আরবি পড়তে। মা বিনা পয়সায় শ শ ছেলেমেয়েকে আরবি শিক্ষা দিতেন।

মা বলতেন, এই পোড়া সংসারের ঘানি টানতে টানতে ধর্ম–কর্মের কোনো কাজ সঠিকভাবে করতে পারছি না। আল্লাহ যদি এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আরবি শেখানোর বদৌলতে মাফ করে তাহলেই রক্ষা।

হাজেরাদের বাড়িটি ছিল ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের মতো। সবাই নামাজ–রোজা আর ইসলামি গজল, কবিতা ইত্যাদিতে পারদর্শী ছিল। হাজেরার মনে পড়ে, সকালে বাবা যখন বাইরের ঘরটিতে ফজরের নামাজ পড়তেন তখন নামাজের মধ্যে কি সুন্দর করে সূরা তেলাওয়াত করতেন এখনো তার কানে মধুর সুর হয়ে বাজতে থাকে। নামাজ শেষে কোরআন শরিফ পড়ে বাবা গ্রামের মাদ্রাসায় ছেলেমেয়েদের আরবি পড়াতে যেতেন।

বাবা মাদ্রাসায় আর মা বাড়িতে আরবি পড়াতেন। বাবা অবশ্য মাসে ১০ টাকা পেতেন। মাদ্রাসা থেকে বাবা ৯টার মধ্যে বাড়ি ফিরে গোসল করে স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতেন। বাবাকে রেডি করে স্কুলে পাঠানোর আগ পর্যন্ত হাজেরা অন্য কোনো কাজ করতে পারতো না। বাবাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে অন্য কাজে হাত দিতো হাজেরা।

সন্ধ্যায় মাগরিবের আগে বাবা ফিরতেন স্কুল থেকে। তারপর সামান্য কিছু মুখে দিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়ে যেতেন দুইটি বাড়িতে টিউশনি করতে। সেখান থেকে পেতেন বিশ টাকা। বাবার মোট আয় ছিল মাসে সত্তর টাকা। মামলাটি না থাকলে তারা এই টাকায় বেশ ভালোভাবেই চলতে পারতো। মা বাড়িতে কুটির শিল্পের কিছু কাজ করে যা আয় করতেন তা দিয়ে অতিথি, আত্মীয়স্বজন আপ্যায়ন আর বিশেষ সময়ে খরচ হতো। কিন্তু মামলার টাকা জোগাড় করতেই সকলের নাভিশ্বাস যেতো।

হাজেরা অনেক দিন থেকে ভাবছে, এ মাসে বাবাকে একটি ছাতা কিনে দেবে। প্রতিদিনের ছয় মাইল রাস্তা খোলা আকাশের নিচে ঝড়, বৃষ্টি আর সূর্যের তাপ থেকে বাচতে ছোট্ট একটি ছাতা অনেক উপকার করে। কাউকে কিছু বলেনি সে। ভেবেছে ছাতাটি কিনে বাবাকে চমকে দেবে। কিন্তু তার ছোট মনটা ভঙে গেল ছাতা কেনার আগেই।

বাবা একদিন সন্ধ্যায় একটি ছাতা, একটি কোরআন শরিফ এবং এক গাছি ফুলের মালা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। চেয়ারটায় বসে যখন বাবা বললেন, আমাকে আজ থেকে তারা ছুটি দিয়ে দিল রে মা। আমাকে আর অতোদূর হেটে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কষ্ট করতে হবে না।

বাবার চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া। মাসে মাসে চল্লিশটি টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেল। বাবা ছাতা পেয়ে খুশি হতে পারলেন না। পারলেন না মন খুলে হাসতে। যে বাবা কোনো কিছুতেই মন খারাপ করতেন না তার মুখে এমন কালো ছায়া দেখে হাজেরার বুকটি কেপে ওঠে। মনে পড়ে, বাবা যখন টিউশনি শেষে বাড়ি ফিরতেন তখন রাত প্রায় নয়টা বেজে যেতো। গ্রামের বাড়িতে নয়টা মানে অনেক রাত। চারদিকে কোনো কোলাহল নেই শুধু শোনা যেতো ঝি ঝি পোকার একটানা *ঝি ঝি* শব্দ। ভাত বেড়ে বাবাকে খেতে দিয়ে মা শুরু করতেন সংসারের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের কথা। বাবা এক মনে ভাত খেয়ে উঠে যেতেন। একটি কথাও বলতেন না। হাজেরা তখন পাটি পেড়ে কুপি বাতির আলোতে এক মনে সেলাই করে যেতো। মাও জানতেন বাবা কিছু বলবে না। কারণ বাবার যেটুকু ক্ষমতা তার সবটুকুই তিনি এ সংসারের কাজে লাগিয়েছেন।

বাবার জন্য হাজেরার আর ছাতা কেনা হলো না। কারণ ছাতা মাথার দিয়ে বাবা এখন কোথায় যাবেন। বাবাকে তো তারা ছুটি দিয়ে দিয়েছে।

কই মা, কিছু বলছো না যে, কিছু মনে করতে পারছো না?

হুম! মেয়ের কথায় বাস্তবে ফিরে এলো হাজেরা। একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আজ থাক, আরেকদিন বলবো।

মধ্যমনিপুর, মিরপুর থেকে

প্রণাম

কে এইচ বি

একদিন আমি আর নীলা পার্কে বসে বাদাম খাচ্ছিলাম। নীলা হচ্ছে আমার ইয়ে। সময়টা ভালোই কাটছিল। এর মধ্যে হঠাৎই নীলার মাস্তান ভাই, কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ভয়ে আমার ও নীলার আত্মারাম খাচা ছাড়া হবার যোগাড়।

দ্রুত মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। সাই করে নীলার টিপ ছাতাটা মেলে ধরলাম। সেদিনের মতো বড় বাচা বেচে গেলাম ছাতার জন্যই। আমার চেহারা মোবারকের ইতিহাস এখনো ঠিক আছে। ছাতার আবিষ্কারককে শত কোটি প্রণাম।

চট্টগ্রাম থেকে

খোলা দরজা

এসএম বাবলু

গ্রামের লোকজন আমাকে খুব ভালো জানে। কারণ আমি গ্রামের অন্যান্য উঠতি বয়সের ছেলেদের মতো উচ্ছৃঙ্খল প্রবণ নই। প্রয়োজন ছাড়া মোটেই কথা বলি না। আমার ছেলেবেলা থেকেই লজ্জা একটু বেশি।

হাওয়া নামের মেয়েটি আমাদেরই গ্রামের এবং আমরা একই ক্লাসে পড়তাম। অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে সে কখনোই স্কুলে যেতে চাইতো না। কারণ সে কাউকেই বিশ্বাস করতে পারতো না। হাওয়া খুব রূপসী ছিল বলে উঠতি বয়সের তরুণেরা তার দিকে বদনজরে তাকাতো।

একবার তার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর মাধ্যমে গ্রামের এক বখাটে ছেলে তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল। বান্ধবীও বখাটের পক্ষপাতিত্ব করেছিল। সেই থেকেই সে কোনো বান্ধবীকে বিশ্বাস করতে পারতো না। এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে, তার স্কুলে যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম।

একদিন তাদের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছি। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও হাওয়াকে ভাবিনি। সে জানালা দিয়ে আমাকে দেখা মাত্র দৌড়ে এসে আমার পথ আগলে ধরলো এবং এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বললো, লাজুক এবং কাপা কাপা গলায় কথাগুলো বলেছিল। কথা শুনে মনে হলো, সে নিশ্চয়ই আমার মতো লাজুক প্রকৃতির। আমাকে ওয়াদা করালো সে না আসা পর্যন্ত যেন আমি স্কুলের পথে পা না বাড়াই। সে আমাকে কেন যে এতো বিশ্বাস করেছিল তা আমার জানা ছিল না। হয়তো আমার সারল্যতাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল। পরের দিন হাওয়া এলো, দুইজন একত্রে স্কুলে গেলাম। এখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু। অবশ্য আসল কাজ হয়েছিল একটি ছাতার মাধ্যমে। ক্লাস টেনে ওঠার পর থেকে দুজনের মধ্যেই চাপা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল। লজ্জার কারণে কেউ কাউকে কিছু বলতে পারছিলাম না। তাই সামনেও অগ্রসর হতে পারছিলাম না। তার জার্মানি ফেরত এক মামা তার জন্য অনেক কিছুই এনেছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল ছাতা এবং অন্য সব জিনিসের চেয়ে ছাতাটিই তার ছিল বেশি প্রিয়। সে লুকিয়ে আমাকে একটা সেন্ট দিয়েছিল যা তার মামা জার্মানি থেকে এনেছিলেন। তখন বর্ষাকাল ছিল বলে হাওয়া প্রতিদিনই তার মামার দেয়া ছাতাটি নিয়ে স্কুলে যেতো। আমিও বেশির ভাগ সময় ছাতা নিয়ে যেতাম। সেদিন হয়তো ইচ্ছা করেই ছাতা নিয়ে যাইনি। মাঝ পথে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আশপাশে কোনো বাড়ি ঘর না থাকায় কোনো উপায় খুজে পাচ্ছিলাম না। খানিক দূরে বড় রকমের একটি বট গাছ এবং কিছু অন্যান্য গাছও আছে। হাওয়া ছাতা নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আসছিল। যেই আমি দৌড় দিয়ে বট গাছের নিচে দাড়াতে যাচ্ছিলাম ঠিক সেই মুহূর্তে আমার শার্টের কলার ধরে রাগতস্বরে হাওয়া বললো, তুমি কেমন ছেলে?

আমি বললাম, কেন?

আরো বেশি রাগতস্বরে সে জবাব দিল কেন বুঝতে পারছো না? আমার হাতে ছাতা আছে তুমি দেখতে পাও না? আমার সঙ্গে ডাবলিং করলে তোমার কি এমন ক্ষতি হবে? তোমার সরলতায় বিশ্বাস করি বলে তুমি ভেবো না যে, আমি খুব অসহায়। প্রয়োজনে লেখাপড়া বন্ধ করে দেবো। তবুও কারো করুণা হয়ে পেছনে পেছনে আসা যাওয়া করবো না। তারপর কাদো কাদো কণ্ঠে বললো, জবাব দাও, আমার ছাতা এবং আমি তোমার কি এমন ক্ষতি করেছি যে, তুমি আমার ছাতা এবং আমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারো না? তুমি কি নিজেকে ফেরেস্তা মনে করো নাকি হ্যা?

আরো অনেক প্রশ্ন করেছিল যা এই মুহূর্তে মনে পড়ে না। এতো সব অভিমানী প্রশ্ন যেন তার বুকে অনেকদিন যাবৎই চাপা পড়েছিল যে রকম অপ্রকাশিত কষ্টে আমিও ভুগছিলাম। আমি হাওয়াকে নম্র ও স্বাভাবিকভাবে বললাম, তোমার ছাতা তো ছোট। তাছাড়া তুমি মেয়েমানুষ আর আমি...।

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই হাওয়া বললো, হয়েছে হয়েছে তুমি কেমন বীরপুরুষ তা আমার বুঝতে বাকি নেই। এবার ছাতার নিচে এসো, তারপরে কথা বলো।

মেয়েমানুষ যে এতো সুন্দর হয় তা একই ছাতার নিচে এসেই বুঝলাম। এর আগে শুধু কল্পনা করেছি। নিজের কাছে মনে মনে প্রশ্ন করি, এই আমি বোকারাম, জ্বলজ্যান্ত একটা মেয়েমানুষকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখছি এবং একই ছাতার নিচে দাড়িয়ে গায়ে গা ঘেষিয়ে।

এতোক্ষণ ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির মধ্যে দাড়িয়েই দুজনের মিষ্টি মিষ্টি মান অভিমানের ঝগড়া শেষ করে সমঝোতায় পৌছালাম এবং তার কথা মতো ছাতার নিচে দাড়িয়ে প্রস্তাব রাখলাম যে, চলো সামনের বট গাছের নিচে গিয়ে দাড়াই। তাহলে আমাদের ভিজতে হবে না এবং বৃষ্টি থামলেই আমরা রওনা হবো।

বট গাছ পর্যন্ত যেতে যেতে হাওয়ার সঙ্গে দুই তিনবার ঘষা লেগেছে। তখন আমার আপাদমস্তক কাপতে শুরু করেছিল। এক সময় আমার কাধ ধরে ঝাটকা টান দিয়ে বললো, শুধু শুধু ভিজছো কেন? আমার গা ঘেষে থাকতে পারো না?

হাজার হাজার ধন্যবাদ জানাই তার জার্মানি ফেরত মামার দেয়া ছাতাটিকে। কেননা এর বদৌলতে কোনো মেয়েমানুষের সাহচর্য পাই এবং এই প্রথম কোনো মেয়েকে স্পর্শ করি, তার হাতে মুখে, চুলে, বুকে, এমনকি তলপেট পর্যন্ত। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি ঝরছেই, থামার কোনো আভাস পাওয়া যায় না। আমরা দুটি কপোত-কপোতী বট গাছের তলায় একটি ছাতার নিচে দাড়িয়ে আছি। আশপাশে লোকজন থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যেদিকে তাকাই সেদিকে শুধু ধান পাট ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। জায়গাটি জনশূন্য এবং নীরব থাকায় অন্য রকম কিছু ভাবতে ভাবতে দুজনেই এতোক্ষণে ভিজে গিয়েছি। স্কুল ড্রেস সম্পূর্ণ শাদা ছিল বলে তার স্তনের বোটা, উরু, এমনকি নাভির ছিদ্র পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ পর্যন্ত।

কতোক্ষণ পরে আমাকে হালকা একটা ধাক্কা মেরে বললো, বীরপুরুষ, ছাতাটা একটু ধরো, আমি ওড়নাটা চিপিয়ে পানি শূন্য করে নিই।

তার কথা বলার ভঙ্গি এবং অভিনয় ছিল যৌন আবেদনময়ী। আমি ছাতা ধরলাম। হাওয়া ওড়না এবং দেহের বসন দেহে রেখেই চিপতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে আমি আরো সাহসী হয়ে উঠেছি তার

নমনীয়তা এবং আদরের কারণে। অনুরোধের দৃষ্টিতে বললাম, ওড়না ছাড়াই তোমার বুকের দিকে তাকাতে আমার খুব ভালো লাগে।

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আদরের ভঙ্গিতে আমার নাক ধরে আস্তে মৃদু চাপ দিয়ে বললো, আরে, এই সব দৃশ্য দেখার চোখও দেখি তোমার আছে।

আরো সাহসী হয়ে বললাম, ওড়না ছাড়া আরো কিছুক্ষণ থাকো না?

সে বললো, বেশ তো থাকলাম, এবার ভালো করে এবং মন ভরে দেখো।

এরপর একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় হাতাহাতি, চিমটি কাটা, খোচা মারা, চুল ধরে টানাটানি এবং গায়ে গা মিশিয়ে জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে ঠোটে ঠোট রেখে চুমু খাওয়া। সে আমার বিশেষ অঙ্গটিতে কয়েকবার হাত বুলিয়েছে, আমিও তার বিশেষ অঙ্গটিতে কয়েকবার হাত দিয়েছি। ধীরে ধীরে দুজনেই উগ্র মেজাজি হয়ে উঠতে লাগলাম। আমাকে জড়িয়ে ধরে সে খুব জোরে একটা চাপ দিচ্ছিল। মুহূর্তের মধ্যে আমার সমস্ত দেহ দুমড়ে মুচড়ে শিহরিয়ে উঠলো। দুজনেই রেড সিগনাল পার হতে চলেছি এবং মুহূর্তের মধ্যেই আমরা স্বর্গ সুখের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেলাম। কতোক্ষণ ছিলাম জানি না। কি ঘটেছিল তাও জানি না। তবে অনুমান করতে পারি যে, দুজনেই অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেহুশ অবস্থায় ছিলাম। হুশ হওয়ার পরে লক্ষ্য করলাম, দুজনেই কর্দমাক্ত দেহ নিয়ে দুর্বল অবস্থায় একে অপরকে জড়িয়ে শুয়ে আছি।

পর্ব শেষে লাজুক হেসে হাওয়া বললো, তোমাকে মজা দেখাবো, তুমি দুষ্টু হয়ে গেছো।

তখনো বৃষ্টি থামেনি। বই-পত্র, জামা-কাপড়, সমস্ত দেহ ভিজে কর্দমাক্ত হয়ে গিয়েছিল বলে দুজনেই একটু চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। বাড়িতে বেশি জবাবদিহি করতে হয়নি। অল্পতেই সারতে পেরেছি বলে খুব খুশি খুশি লাগছে।পরের দিন দুজন একত্রিত হওয়ার পর লজ্জায় একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে পারছিলাম না। এক সময় বললাম, হাওয়া, তুমি খুব ভালো মেয়ে।

হাওয়া জবাব দিল, ভালো বলেই তোমাকে ছাতার নিচে জায়গা দিয়েছি।

এসএসসি-তে দুজনেই প্রথম বিভাগে পাস করেছিলাম। পাস করার এক বছর আগ পর্যন্ত দুই লাজুকের কাজ ভালোই চলছিল। পাস করার পর তার মামাবাড়ির কাছে একটি ভালো নামি-দামি কলেজে ভর্তি হলো। এরপর তার সিঙ্গাপুর ফেরত মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হলো।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, ভালো বলেই তুমি তোমার মামাতো ভাইকে বিয়ে করেছো?

হাওয়া জবাব দিল, তুমি ভালো বলেই তোমার জন্য আমার দরজা সব সময় খোলা থাকবে।

গাজীপুর থেকে